সারৎসার বিবরণ

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প

পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা

নিবেদিত:

পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, ভারত সরকার

নির্মান

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

তিরুবন্তপুরম

নভেম্বর ২০০৯

সম্পাদিত বিবরণের সারৎসার

ভূমিকা

১) ভারতের তটরেখা ৭,৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত, তার মধ্যে ৫,৪০০কিলোমিটার উপদ্বীপ-উপকূলবর্তী ভারত এবং বাকি অংশ দ্বীপসমূহ অর্থাৎ আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ। বিশ্বের মাত্র ০.২৫% উপকূল অঞ্চল নিয়েও ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী এলাকায় ৬৩ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করেন। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ % মানুষ এই সব সমুদ্রতটবর্তী নীচু অঞ্চলে বসবাস করেন। সমুদ্র তটবর্তী জেলাগুলিতে (দেশের ৫৯৩ টি জেলার মধ্যে ৭৩ টি) দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৭% মানুষ বসবাস করছেন, তটরেখা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার স্থল ভাগে প্রায় ২৫০ মিলিয়নের কাছাকাছি মানুষ জীবনযাপন করছেন। এই উপকূল ঘন জনবসতিপূর্ণ মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, কোচি, বিশাখাপত্তনমের মত ৭৭ টি শহরকেও ছুঁয়ে গেছে।

২) ভারতের আর্থিক উন্নতিতে প্রয়োজন উপকূল ও সামুদ্রিক সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণের সঠিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নানা ধরনের বাদাবন, প্রবাল শৈলশ্রেণী, সামুদ্রিক ঘাস, লবনাক্ত গুল্ম, বালিয়াড়ি, নদী মোহনা, সমুদ্র সম্পৃক্ত উপহ্রদ ও অগুন্তি জলজ ও ভূমিজ প্রাণীর সমাহার, যা এই অঞ্চলকে নিজ গুনেই সমৃদ্ধ করেছে। এই বিশাল পরিত্যক্ত উপকূল এলাকার প্রায় ৬ ,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নানা রকমের বাদাবনের জঙ্গল, যা রয়েছে সুন্দরবন ও ভিতরকনিকায়, এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাদাবনের জঙ্গল। এছাড়াও রয়েছে প্রবালের বিশাল ভান্ডার, মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী, কচ্ছপ, আরও নানা সরীসৃপ নানা ধরনের সামুদ্রিক ঘাস ও লবনাক্ত গুল্মের সম্ভার। দেশের বেশীরভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের ভান্ডারও এই সমুদ্র ও উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এই উপকূলের ৩৫ % শতাংশ এলাকা মূল্যবান খনিজ সামগ্রী ও ভারি খনিজ পদার্থে বোঝাই হয়ে আছে। সমুদ্র সৈকতে ঝড়ো হাওয়া, নিরন্তর ঢেউয়ের মাধ্যমে শক্তি উৎপদান ও ভবিষ্যতের সামুদ্রিক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এছাড়াও ভ্রমন স্থান, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবেও কিছু উপকূল অঞ্চল চিহ্নিত হয়েছে। ভারতের আর্থিক পরিকাঠামোয় সমুদ্র উপকূলের ভূমিকা বিশাল , যেমন, নৌ-বানিজ্য, পেট্রোলিয়াম শিল্প, আমদানী বানিজ্যেও উপকূল ভূমি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ কারনেই ভারতে ১৯৭ টি বড় ও ছোট সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছে, ৩০৮ টি বড় শিল্প সংস্থা এবং ৭৭ টি উপকূলবর্তী নগর গড়ে উঠেছে। মৎস শিকারও অসংখ্য মানুষকে রুজি রুটির সন্ধান দিয়েছে, দেশের উপকূলবর্তী ৩ ,৬৩৮টি মৎসজীবিদের গ্রামে ও ২২৫১ টি মৎস বন্দরে লক্ষাধিক মানুষ মাছ ধরে এবং মাছ ধরার পর মৎস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও প্রায় ১.২ মিলিয়ন মানুষ আজ কর্মরত।

৩) যতই প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হোক বা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখুক না কেন , দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল কিন্তু ভালো নেই। দ্রুত নগরমুখী-শিল্পায়ন, নৌ-পরিবহন, সমুদ্রে মাছ ধরা, পর্যটন বানিজ্য, খনিজের জন্য সমুদ্র বক্ষে ও উপকূলে খনন , খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন , বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রানীর চাষ এবং সাম্প্রতিকতম স্পেশাল ইকনমিক জোন স্থাপনের হুড়োহুড়িতে ক্রমাগত পরিকাঠামো গঠন ও নির্মান কার্যে, উপকূলবর্তী প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতিই করছে। বিগত ৪০ বছরে ৩৪ % ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়েছে ভারতে, প্রায় ৬৬% প্রবাল শৈলমালা ক্ষতিগ্রস্ত, সামুদ্রিক মাছের ভান্ডার প্রতিনিয়ত কমছে এবং অ্যাকুরিয়াম ফিস , সামুদ্রিক শশাও দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যদি অবিলম্বেই এই ক্ষয় রোধ না করা যায় তবে উপকূলবর্তী মানুষের জীবন -জীবিকা, স্বাস্থ্য এমনকি

দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নতির উপরও আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসবে।

৪) উপকূলের অবক্ষয় আর্থিক , জনজীবন এবং জীবিকার নিরাপত্তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতের উপকূলে বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘনিয়ে এসেছে , এরমধ্যে ২০০৪ সালের সুনামি, বেশ কিছু সুপার সাইক্লোন, বছরে গড়ে ন'টির মতো সাইক্লোনে প্রচুর প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। মূলত দারিদ্রের কারনেই এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলা করার ক্ষমতা উপকূলবর্তী গ্রামীন মানুষের কম , প্রায় নেই বললেই চলে। সাম্প্রতিক সময়ে উপকূলবর্তী অঞ্চলের দ্রুত ভূমিক্ষয় উপকূলবাসীদের চাষাবাদ ও জীবন জীবিকার উপরও প্রভাব ফেলেছে , পরিবেশের নানা রকম অবনমনন এবং অতিরিক্ত সম্পদের ব্যবহারের ফলে প্রথাগত মাছ ধরা থেকেও রোজগার কমে এসেছে। ক্রমান্বয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন উপকূলবর্তী জনসাধারণ ও পরিকাঠামোর উপর বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করেছে। গবেষণায় সমুদ্র তলের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে, আবহাওয়ার নানা পরিবর্তনের সময়ানুবর্তীতারও তীব্রতার পরিবর্তন এবং বায়োফিজিক্যাল ও মানববৃত্তি প্রক্রীয়ায়ও বদল লক্ষ্য করা গেছে। মাত্র এক মিটার সমুদ্র তলের বৃদ্ধি মানেই ভারতের ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বন্যায় প্লাবিত হবে, প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ যারা নীচু এলাকায় বসবাস করেন তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, ভিটে-মাটি ছাড়া হবেন। আবহাওয়ার এই বদল যে বড় পরিকাঠামো নির্মানে, বিনিয়োগে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, বন্দর, শিল্পায়াণ ও নানা পরিষেবা।

৫) সামুদ্রিক ও উপকূল সম্পদ আহরণের জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে : অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাম্প্রতিক কালে নতুন ও বড় বড় বিনিয়োগ উপকূল অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে , আরও বেশি বন্দর স্থাপনের মাধ্যমে দেশের মূল কেন্দ্রবিন্দুর বাইরের পশ্চাদপদ অঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রবেশ পথ হিসাবেই এইসব বিনিয়োগ আসছে। নির্মান শিল্পের অগ্রগতি, অপরিকল্পিত পর্যটন ব্যবস্থা, উপকূল অঞ্চলের আধা -শহুরে, গ্রামীণ জনসমাজকে আরও বেশি করে পরিকাঠামো নির্মানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি বেশ কিছু অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির কর্মকান্ডে এই সব বিনিয়োগকারীরা প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার , অতি-ব্যবহার এমনকি ক্ষতিও করছে। দেশের কিছু উপকূল অঞ্চলে বানিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রানীর চাষের জন্য বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। উপকূলের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা সাইক্লোন ইত্যাদিও বাড়ছে নিয়মিত , এখন মূখ্য বিষয় হল এই সব উন্নতি ও প্রয়োজনকে কতটা প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই করে দীর্ঘমেয়াদী করা যায় সেটাই নির্ধারণ করা।

৬) অত্যধিক শতধা-বিভক্ত নীতি, অসম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোই সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির অন্তরায়: দেশের উপকূল অঞ্চলের পরিচালনা বজায় রাখতে একটি সংবধবদ্ধ বিধি ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করার অভাব দেখা যায়। যা প্রতিষ্ঠানের বহুধাবিভক্ত হওয়াকে প্রমান করে এবং আইন অর্থনীতি সব কিছুতেই এই অসহায়তা প্রতিফলিত হয়। এই নানা বিভাগে বিভক্ত প্রশাসন উপকূল এলাকা পরিচালনার বড় অন্তরায়। আবার অংশগ্রহনের পরিকল্পনা ও নিজস্ব ম্যানেজমেন্টে ফারাক থাকায় বিনিয়োগকারীরাও আলাদা ভাবে কাজ করে। পাশাপাশি আবার উপকূল অঞ্চলে বিভিন্ন অংশীদারের পরস্পর বিরোধী এবং প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ বর্তমান। এর কারন হল পরিচালনা ক্ষেত্রে অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পনার অভাব। দেশের আর্থিক উন্নতি ও দারিদ্রদূরিকরণের প্রক্রিয়ায় যে সব বড় ছোট বিনিয়োগ হয় সবই তাৎক্ষনিক, দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথা অনুসন্ধান করে করা হয়না। উপকূল এলাকার সম্ভাবনা , অসুবিধা, তার ফলে কি ফল হতে পারে এইসব বিশ্লেষণ না করেই নীতি ও পরিকল্পনা গৃহিত হয়। এর মূল কারন হল উপকূল অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ , প্রাকৃতিক ক্রীয়া এবং তার প্রতিক্রীয়া বা প্রভাব এবং পরিচালনা সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারনার অভাব।

৭) পরিবেশ সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ এর অন্তর্গত কোষ্টাল রেগুলেশন জোন (সি আর জেড) ১৯৯১, মোতাবেক ভারতের উপকূল অঞ্চলকে কিছু নিয়ম কানুনের নিগড়ে বেঁধে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই আইন উপকূল

অঞ্চলের প্রাকতিক ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও সার্বিক বিকাশে যথেষ্ট কার্য্যকর নয়। এই ১991 এর নোটিফিকেশন বলে জোয়ার ভাটার প্রভাবজনিত এলাকার জোয়াররেখা থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে সমুদ্র সৈকতে কোনরকম নির্মান ও উন্নয়নমূলক কাজে বিধিনিষেধ বর্তমান। বিগত দশকে নানা মহল থেকে এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার বা একটি যুক্তি গ্রাহ্য সমাধানের দাবী উঠেছে, সেই সঙ্গে এই আইন ভঙ্গেরও প্রচুর উদাহরণ চোখের সামনে এসেছে।

৮) এই সব বিষয়ে দীর্ঘ ধারনা লাভ করে ভারত সরকার এক দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট সমাধান ও উপকূলের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন জাতীয় জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০০5 এ প্রণয়ন করেছেন। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই প্রথম পর্বে একটি সংঘবদ্ধ উপকূল অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ নীতি প্রনয়নে উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে দেশের দীর্ঘমেয়াদের প্রয়োজনগুলিকে মাথায় রেখে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠনের ও জ্ঞান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্বের অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় **ইন্ডিয়া ইন্টিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট** (আই সি জেড এম) নামে একটি প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। এই জাতীয় স্তরের প্রকল্পে প্রাথমিক ভাবে জাতীয় স্তরে এবং তিনটি রাজ্যের উপকূল এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা ও রূপায়নে জোর দেওয়া হবে। প্রাথমিক ব্যাখ্যা ও পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেলে এবং প্রদর্শনমূলক ভাবে এই তিনটি রাজ্যে রূপায়িত হলে এই প্রকল্প দেশের অন্য ন'টি উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও রূপায়িত হবে। এই রূপয়ান ভারত সরকারের অর্থ সহায়তায় এবং সম্ভবত কিছু অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সম্পন্ন হবে। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা দেশের অন্যান্য উপকূলবর্তী রাজ্যের সমুদ্র উপকূলের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণে কাজ দেবে বলে আশা করা যায়।

৯) এই সংঘবদ্ধ সুপরিকল্পিত উপকূল রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প উপকূলবর্তী ও সামুদ্রিক অঞ্চলের উন্নয়নে দীর্ঘ সময়ের সুফল বয়ে আনবে। এই এলাকার আর্থ সামাজিক বিকাশ, আর্থিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষ্টি , সংস্কৃতির রক্ষনাবেক্ষণ , বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ দেশের বিকাশেও কাজে আসবে। সুচিন্তিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক বিকাশ দারিদ্র দূরিকরণে কার্য্যকরী হবে। এই প্রকল্প এবং এতে উল্লিখিত যে সব সংস্কারের সওয়াল করা হচ্ছে তার ফলে উপকূলবাসীদের ঝুঁকি , প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপদের সম্ভাবনা , যা আবহাওয়া পরিবর্তেনর জন্য বাড়তে পারে, তার সম্ভাবনা হ্রাসে সহায়তা করবে।।

প্রকল্পের বিবরণ:

১০) এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল উপকূল অঞ্চলের রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হয়েছে তার আলোকে সমগ্র উপকূল অঞ্চলের একটি স্থায়ী ও সুস্থিত উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ করার জন্য জাতীয় স্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারত সরকারকে সহায়তা করা। দেশের তিনটি রাজ্য গুজরাট, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কাজ করাও প্রকল্পের একটি উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের চারটি ভাগ, প্রথম ভাগ হলো জাতীয় স্তরে যোগ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি এবং অন্য তিন ভাগ হলো তিনটি রাজ্যের কয়েকটি স্থানীয় স্তরে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব ক্ষমতাবৃদ্ধি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অধ্যয়ন ও পরিকল্পনার যৌথ রূপায়ণ।

প্রথম ভাগ: জাতীয় উপকূল অঞ্চলের ক্ষমতা নির্মান :

১১) প্রকল্পের জাতীয় ভাগে রয়েছে- ক) মানচিত্র তৈরি, এলাকা নির্নয়, মূল ভূখন্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপকূল অঞ্চলের বিপদ রেখা চিহ্নিত করা ; খ) মানচিত্র বানানো, বাস্তুতন্ত্র অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষের উপকূল রেখা বরাবর স্পর্শকাতর

এলাকা চিহ্নিত করা ; গ) পরিবেশ মন্ত্রালয়ের ক্ষমতাবৃদ্ধি করে এন সি জেড এ'র সচীবালয় হিসাবে প্রস্তুত করা এবং দেশের উপকূল অঞ্চল জুড়ে ইন্টিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ঘ) নতুন ন্যাশানাল সেন্টার ফর সাসটেনেবল্ কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট স্থাপন করা ও ঐ কেন্দ্রের কাজ শুরু করা।

১২) মানচিত্র অঙ্কন, বিপদ সীমারেখা নির্ণয় ও চিহ্নিত করা: স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মতো পরিবেশ মন্ত্রালয় ২০০৬ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে, উপকূল অঞ্চলের বিপদ সীমা নির্ণয় করে এলাকা চিহ্নিত করে মানচিত্র অঙ্কন করার নিয়ম নির্ধারণ করতে। বিশেষজ্ঞ কমিটি মানচিত্র অঙ্কনের একটি বাস্তবসম্মত পন্থা সুপারিশ করেছে, মূলত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা , উপকূলের ঢেউয়ের উচ্চতা , নিয়মিত গতি প্রকৃতি অধ্যয়নের মাধ্যমেই এই বিপদসীমা রেখা নির্ধারণ করা হবে। এই বিষয়ে বিভিন্ন বিকল্পের বিস্তারিত আলোচনা ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তুতির সময়েও এই পদ্ধতি নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌছাতে বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে বেশ কিছু কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত প্রকল্পের প্রতিটি রাজ্যের স্বার্থজড়িত অংশীদারদের অবহিত করা হয়েছে এবং তারাও এই চূড়ান্ত পদ্ধতিতে সম্মতি জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের মূল ভূখন্ডের উপকূল অঞ্চলে এই বিপদ রেখা মানচিত্রে নির্ধারণ করা হবে ১০০ বছরের বন্যার (যার মধ্যে সমুদ্রের জলতলের সম্ভাব্য উচ্চতা বৃদ্ধিও থাকবে) এবং ১০০ বছরের সম্ভাব্য ভূমিক্ষয়ের খতিয়ান দেখে। দুটি আলাদা রেখাকে মিশ্রভাবে বিবেচনা করে স্থলভাগের দিকে এই রেখা নির্ণয় করা হবে। এটি করা হবে যথাক্রমে- ক) মূল ভূখন্ডের উপকূলে ০ .৫ মিটার অন্তর জরিপ ও ডিজিটাল টেরান মডেল প্রস্তুত করা ; খ) ১০০ বছরের জোয়ার ভাঁটার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে ১০০ বছরের বন্যার জলতল নির্ণয় করা ; গ) ১৯৬৭ সাল থেকে বিভিন্ন মানচিত্র ও কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তোলা চিত্র বিশ্লেষণ করে ১০০ বছরের ভূমিক্ষয় রেখার একটা আন্দাজ করা ; ঘ) বিভিন্ন তথ্য সংবলিত বিভিন্ন মানচিত্র তৈরি করা ও ডিজিটাল টেরেন মডেলে বিপদরেখার উল্লেখ করা এবং ঙ) জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিপদরেখার ভৌগলিক মানচিত্র প্রকাশ। একবার বিপদরেখা নির্দিষ্ট হয়ে গেলেই জমিতেও এই সীমানা নির্দেশম প্রস্তর খুঁটি নির্মান করা হবে। উল্লেখ্য যে রাজস্ব-মানচিত্র যেগুলি স্থানীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে এই ভৌগলিক মানচিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন। এই মানচিত্রের যথাযথ প্রচার সেই সঙ্গে জমিতে নির্মিত বিপদসীমার সীমানা নির্দেশক দেখে নির্মানকারী ও বিনিয়োগকারীরা কোথায় নির্মান করা যাবে এবং কোথায় যাবেনা তা নিজের চোখে দেখেই বুঝতে পারেন। এরফলে প্রতিক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিনিয়োগকারীদের বারবার বিনিয়োগ করতে হবেনা। একবার মানচিত্র ও বিপদরেখা চিহ্নিতকরণ হয়ে গেলে এই রেখা রাজ্য স্তরে বা স্থানীয় স্তরে স্থলভাগের দিকে কতখানি এলাকা অবধি আই সি জেড এম পরিকল্পনা করা দরকার তা নির্দেশ করবে।

১৩) মানচিত্র বানানো, বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করা : স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মতো প্রকল্প প্রস্তুতির সময় একটি সমীক্ষা করা হয়েছে, বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকাগুলির (যে গুলির মানচিত্র বানানো হবে) প্রকৃতি , চরিত্র ও বৈশিষ্ট অনুধাবন করতে। বিশেষজ্ঞ ও স্বার্থজড়িত অংশিদারদের মতানৈক্য অনুসারে ১৫টি আলাদা ধরনের বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করা ও মানচিত্র বানানোর দিকে এই সমীক্ষা দিকনির্দেশ করেছে। এই বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকার আওতায় আসে বর্তমানে সংরক্ষিত ন্যাশানাল পার্ক, অভয়ারণ্য (এইগুলির মানচিত্র মোটামুটি ভাবে আছে), বাদাবন, প্রবাল শৈলমালা, সামুদ্রিক ঘাস ও সামুদ্রিক গুল্মের আস্তরণ, উপকূলবর্তী অরণ্য , সমুদ্র সৈকত, বালিয়াড়ি, সমুদ্রতটে অবস্থিত প্রস্তরসম্পৃক্ত পাহাড়, লবনাক্ত গুল্ম, সমুদ্র সম্পৃক্ত উপহ্রদ, নদী মোহনা এবং এই সব জায়গায় থাকা বেশ কিছু প্রানী যেমন বিরল প্রজাতির জলপাই রঙের খোলার কচ্ছপ, এবং অশ্বখুরাকৃতি কাঁকড়া। এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট নির্ধারণ করার জন্য বিস্তারিত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই স্থিরীকৃত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত ও নির্ধারিত হবে।

একবার এই স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিতকরণ হয়ে গেলে, এই স্পর্শকাতর এলাকাগুলির সীমানা ভৌগলিক মানচিত্রে (যা কিনা ব্যবহার করা হচ্ছে বিপদরেখা নির্দিষ্ট করার জন্য) প্রতিস্থাপন করা হবে। কোনো জায়গায় স্পর্শকাতর এলাকা নির্দিষ্ট হলে, ঐ এলাকা সংলগ্ন অংচলকে (যা কোষ্টাল ম্যানেজমেন্ট জোনের অন্তর্ভূক্ত) সি আর জেড-১ বলে অভিহিত করা হবে এবং পরিবেশ মন্ত্রক এই এলাকা সমূহের রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহন করবে।

১৪) নতুন ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ফর কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট স্থাপন : প্রকল্পের প্রস্তুতি পর্বে একটি গবেষণা করা হয়েছে ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিষয়ে। এই সমীক্ষায় আমাদের দেশে আই সি জেড এম এর দক্ষতার ফাঁকগুলির কথা বিশ্লেষন করা হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত**,** আইন সংক্রান্ত এবং কারিগরি ফাঁক খুঁজে বের করা হয়েছে**,** দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন - পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জৈবিক সমুদ্র বিজ্ঞান, উপকূল ভূতত্ত্ব ও ভূতাত্ত্বিক অঙ্গসংস্থান , উপকূলের কারিগরি , মাছ ধরা ও মৎস চাষ, উপকূল ও সমুদ্রপৃষ্ঠের সম্পদ, উপকূলের বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ নির্ণয় , আঞ্চলিক পরিকল্পনা, বাস্তুতন্ত্র পরিচালনা, পরিবেশের কৌশলগত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা, ইন্টিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট, সামুদ্রিক এলাকার রক্ষনাবেক্ষণ, উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রথাগত আচার আচরণ ঐতিহ্যশালী কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং এই সব সুমদ্র উপকূলবাসীদের উন্নয়নের চাহিদা। এর সঙ্গে শুরু হবে সক্ষমতার বিশ্লেষণ যাতে করে চিহ্নিত করা যায় বর্ধিত চাহিদা দক্ষতা ও মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা, প্রাপ্তিসাধ্য দক্ষতার সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রচলিত আইন নীতির উপযোগিতা এবং প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদগুলির বর্ধিত প্রয়োজনীয়তা যাতে করে জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ফাঁক-ফোকরগুলি চিহ্নিত করা যায়। এই গবেষনার ফলাফল, স্বার্থজড়িত অংশীদারাদের সঙ্গে আলোচনা, স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়ে ন্যাশানাল সেন্টার ফর কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট তৈরি হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলিকে সামনে রেখে ভারতবর্ষে ইন্টিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট করা হবে।

১৫) এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় প্রতিবেশ ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা ও রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ও জ্ঞান ভান্ডার গড়ে তুলবে যাতে , যথেষ্ট কারিগরি দক্ষতার সঙ্গে হাতেকলমে উপকূল অঞ্চলের সমস্যার প্রতিবিধান করা যায়, আই সি জেড এম দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের দেখভাল ও মূল্যায়ন করা যায়, সরকার ও বিভিন্ন স্বার্থজড়িত অংশীদারদের নীতিনির্ধারণে পরামর্শ দেওয়া ও পরিকল্পনা রূপায়ণে নজরদারি করা যায়, উপকূল রক্ষনাবেক্ষণের আইনি ও বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলি , উপকূলবাসী , বিশেষজ্ঞ ও সরকারের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের কাজ করা যায় এবং এরা একযোগে কাজ করতে পারেন এবং আই সি জেড এম সংক্রান্ত ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ফলিত গবেষনা শিক্ষা এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া যায় (যার মধ্যে বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানও যুক্ত হবে)। এই লক্ষ্যপূরণ করার জন্য উপকূল রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক বিশ্বমানের এই গবেষনা সংস্থাটি একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৬) পরিবেশ মন্ত্রকের সক্ষমতাবৃদ্ধি: পরিবেশ মন্ত্রকের বর্তমান পরিস্থিতি ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলি খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। এই বিশ্লেষনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এন সি জেড এম -এর সচিবালয় হিসাবে পরিবেশ মন্ত্রক কতটা উপযোগী তা দেখে নেওয়া। আরও একটি বিশ্লেষন করে দেখা হয়েছে যে পরিবেশ মন্ত্রকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কি কি প্রয়োজন যাতে করে আই সি জেড এম বা সুসংগঠিত ভাবে উপকূল পরিকল্পনা এবং রূপায়ন (যা এখন ভাবা হচ্ছে) করা যায়। সেই জন্যই পরিবেশ মন্ত্রকের দায়িত্বের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হবে তাও ভাবা হয়েছে। এই বিশ্লেষণকে নির্ভর করে এবং এন সি জেড এম এ'র সঙ্গে পরামর্শ করে উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে এই বিষয়ে দক্ষতা ও ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলি ডিসেম্বর ২০০৯ এর মধ্যে সেরে ফেলতে হবে - ক) কর্মী নিয়োগের প্রস্তাব (দক্ষতা অনুসারে, কাজের বিবরণ সহ

আলাদা আলাদা বিভাগকে কার্য্যকরী করতে), যন্ত্রপাতি, অফিসের স্থান নির্বাচন ও অন্যান্য কাজ শুরু করার আনুষঙ্গীক বিষয়ে। খ) বিনিয়োগ ও কার্য্যকরী অর্থের সংস্থান এবং একটি সময়সারণী প্রস্তুত করে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলিকে সুনিশ্চিত করা। উল্লেখ্য একধরনের ক্ষমতা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প রূপদানের মাধ্যমেই অর্জিত হবে।

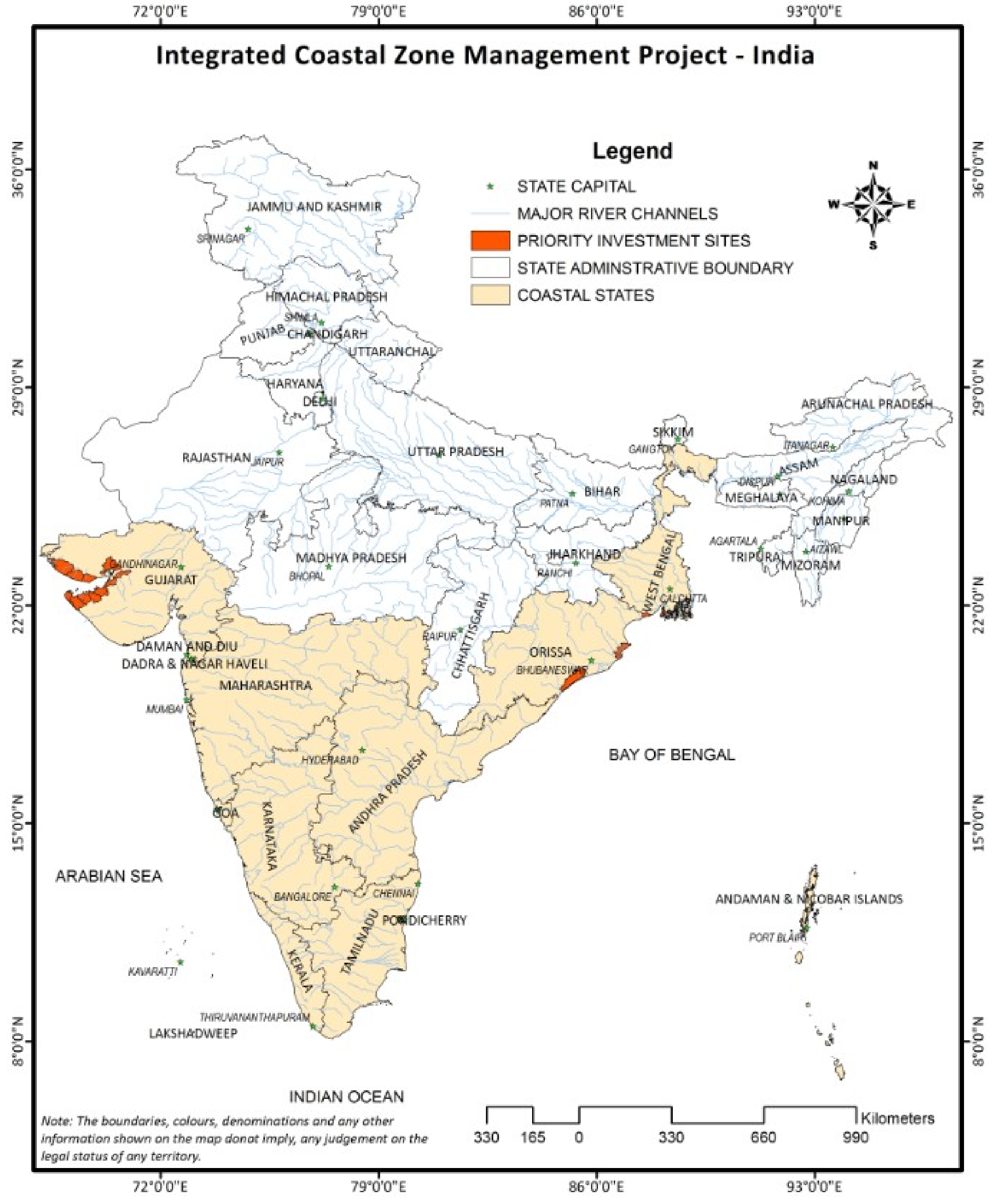

১৭) প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট: এটি কর্মী নিয়োগ ও ন্যাশানাল প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাজে সহায়তা করবে; যথেষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ জিনিস ও মানবসম্পদ সংগ্রহ করার ম্যানেজমেন্ট এর ব্যবস্থা করা; বিভিন্ন তথ্যের আদান প্রদান ও আর টি আই সংক্রান্ত কাজকর্মের রূপায়ণ; গ্রহনযোগ্যতা ও শাসনতন্ত্র কায়েম; তৃতীয় পক্ষ দিয়ে

হিসাব পরীক্ষা; রাজ্যগুলির ও অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে বৈঠক এবং কাজের বিশেষ মান নির্ণয়। আশা করা যায় যে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট যা একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা ভবিষ্যতে উপকূল রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে পরিবেশ মন্ত্রকের অঙ্গ হিসাবে দপ্তরের ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিকল্পনাকে সাহায্য করবে। প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য তৈরি করা পরিকাঠামো যথা প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণের পন্থা, আর্থিক ব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও মূল্য নির্ণায়ক ব্যবস্থা অর্থ ব্যয়ের নিয়ম কানুন এবং হিসাব রক্ষা সবই অন্তরবর্তী স্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

দ্বিতীয় ভাগ: গুজরাটে আই সি জেড এম প্রকল্পের রূপরেখা:

১৮) প্রকল্পের এই ভাগে রয়েছে- ক) রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংস্থাকে এবং প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের উপযুক্ত করে তোলা, যাতে করে পলি আধার অনুসারে (সেডিমেন্ট সেল) উপকূল অঞ্চলের জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা (আই সি জেড এম) তৈরি করা যায়। প্রসঙ্গতঃ এর মধ্যে কচ্ছ উপসাগর অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত এবং খ) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার।

১৯) কচ্ছের উপসাগর এলাকায় আই সি জেড এম পরিকল্পনা: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে উপকূল জোনের সীমানা বিভাজন কোন প্রশাসনিক সীমারেখার বদলে প্রাকৃতিক রেখাদ্বারা নির্ধারিত হওয়া ভালো। স্থলভাগের দিকে উপকূলের সীমানা নির্ধারিত হবে বিপদরেখা দ্বারা এবং তটরেখা বরাবর আঞ্চলিক পলির আধার এই সীমানা নির্ধারণ করবে। পরিকল্পনা হলো কিছু নিয়মিত আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করা যাতে স্বার্থজড়িত অংশীদারেরা নিয়ম করে সরকারকে তাদের কথা জানাতে পারে। এতে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হবে। অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্যও কারিগরি তথ্য নথি নির্ভর হবে। প্রাথমিক স্তরের পরিকল্পনার প্রস্তুতি হিসাবে অংশগ্রহনকারীদের মাধ্যমে উপকূলবাসীদের আর্থ-সামজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করা হবে তাদের প্রয়োজন ও দায়ভার ক্ষমতা কতটা তা বুঝতে। উপকূল অঞ্চলের সেই সমস্ত জনগোষ্ঠী যাদের স্বার্থ এবং জীবন ধারনের উপকরণ এই অঞ্চলের সম্পদও তার সংরক্ষনের উপর নির্ভরশীল তাদেরই এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। চিহ্নিত অংশগ্রহনকারীদের দলগুলি পরিকল্পনার স্তরেও সক্রিয় অংশগ্রহন করবে। সামুদ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ বুঝতে, সম্পদের অনুদান, উপকূলবাসীদের বিপদ ও সঙ্কট , বর্তমানে উপকূল ও সামুদ্রিক সম্পদের উপর ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপ, সেই সঙ্গে এই সব সম্পদের যা অংশগ্রহনকারীরা ব্যবহার করছেন তার মূল্য নির্ধারণ করতে নির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ সহায়তাও লাগবে। এই সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে বিশ্লেষন নির্দিষ্টভাবে তাদের চাহিদা, জরুরি দরকার, দ্বন্দ্ব, উন্নয়নে সুবিধা ও অসুবিধা বুঝতে সাহায্য করবে। পরিকল্পনা পদ্ধতিতে বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আই সি জেড এমের সকল আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলি বুঝতে (যার মধ্যে সম্পদের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত), আঞ্চলিক পরিকল্পনা, সামাজিক সাম্য ও সমতা এবং পরিবেশের রক্ষা করা সম্ভব হবে। আই সি জেড এম নিয়ে অংশীদারদের অঙ্গীকার বিস্তারিত প্রচার করা হবে। সব কটি দলের পরামর্শ মেনে একটি চূড়ান্ত আই সি জেড এম পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। আশা করা যায় যে এই আই সি জেড এম পরিকল্পনা ২০ থেকে ৩০ বছরের স্থানীয় ও পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা নিয়ে হবে, কিন্তু যান্ত্রিক ভাবে শুধুমাত্র আঞ্চলিক উন্নয়নের পরিকল্পনা হবেনা। এই পরিকল্পনার বিষয়বস্তু অংশগ্রহনকারীদের অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করবে যা কোনভাবেই বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকাকে প্রভাবিত করবে না এবং স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশকে মেনে চলবে। এই আই সি জেড এম পরিকল্পনায় রূপায়ণের ব্যবস্থাপনা, কাজের দেখভাল ও মূল্য নির্ধারণ, পরিকল্পনার পর্যালোচনা, অর্থ বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তাব যাতে প্রস্তাবের মাধ্যমে সম্পদ আরোহনে আই সি জেড এম পরিকল্পনা রূপায়ণ করা যায়- এই সমস্ত বিষয়ই থাকবে।

২০) গুজরাটের আই সি জেড এম ক্ষমতাবৃদ্ধি: গুজরাটে এই প্রকল্পের জমি প্রস্তুত করতে বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষমতাবৃদ্ধি

যেমন – বন ও পরিবেশ দপ্তর (যা এস সি জেড এম এ'র সচীবালয়ও), গুজরাট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (উপকূল অঞ্চলে পরিবেশ দূষনের দেখভাল এবং তাকে আটকাতে সাহায্য করবে), গুজরাট পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান গবেষনা ফাউন্ডেশন (উপকূল অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সমীক্ষা ও গবেষনা করার জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রবাল শৈলমালাকে পুনর্গঠনের জন্য নতুন প্রযুক্তি) এবং ভাস্করাচার্য্য ইনস্টিটিউট অফ স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস এন্ড জিও ইনফরমেটিকস (জি আই এস সংক্রান্ত মানচিত্রকরণ এবং উপকূল অঞ্চলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাহায্য করার জন্য তথ্য সমাবেশ করা)। অন্য বিভাগগুলিকে প্রকল্পে মধ্যবর্তীকালে সহায়তা করতে গ্রহন করা হবে।

২১) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার: গুজরাটের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কচ্ছ উপসাগর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ যার বিস্তারিত বিবরণ নীচে দেওয়া হল ;-

ক)<u>উপকূল সম্পদের সংরক্ষন ও নিরাপত্তা -</u>(১) গুজরাট ইকলজি কমিশন দ্বারা বাদাবন সৃজনে বৃক্ষ রোপন, (২) বন ও পরিবেশ দপ্তর কর্তৃক প্রবাল শৈলমালার পুনর্গঠন , (৩) মেরীন ন্যাশানাল পার্ক কর্তৃক বাদাবন ও আশ্রয়স্থল নির্মানে বনসৃজন, (৪) বন ও পরিবেশ দপ্তর কর্তৃক প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ মডেল অনুসরনে দ্বারকাতে একটি সমুদ্র গবেষনা ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন।

খ)<u>পরিবেশ এবং দূষন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা-</u>(১) জামনগর পৌরসংস্থা কর্তৃক জামনগর শহরের পরিবেশ পরিশোধন করা।

গ)<u>উপকূলবাসীদের জীবনসংস্থানের নিরাপত্তা -</u>(১) গুজরাটের উপকূলবর্তী বনাঞ্চল বিহীন গ্রামের বাসিন্দাদের জীবিকার উন্নয়ন করবে গুজরাট ইকোলজি কমিশন, (২) মেরীন ন্যাশানাল পার্ক কর্তৃক উপকূলবর্তী গ্রাম গুলির নিরাপদ এলাকায় ইকোট্যুরিজমের উৎসাহপ্রদান এবং এর মাধ্যমে জীবন সংস্থানের উন্নয়ন।

২২) অগ্রাধিকার বিনিয়োগ ও ক্ষমতাবৃদ্ধি একে অপরের পরিপূরক এবং একই উদ্দেশ্য সাধন করে। এরা একসাথে মূলত কচ্ছের উপসাগর এলাকা এবং সামগ্রিক ভাবে গুজরাটের উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলের পরিকল্পনা ক্ষেত্রে মূল সমস্যাগুলি নিরসনে কাজে আসবে।

২৩) প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট: এটি কর্মী নিয়োগ ও স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাজে সহায়তা করবে; যথেষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ বস্তুর ক্রয় সংক্রান্ত গবেষনা; তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কাজকর্মের রূপায়ণ; অভিযোগ গ্রহন ও তার প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা; গ্রহনযোগ্যতা ও শাসনতন্ত্র কায়েম; কাজের দেখভাল ও মূল্য নির্ধারণ; তৃতিয় পক্ষ দিয়ে হিসাব পরীক্ষা ও সামাজিক নীরিক্ষা; রাজ্যগুলির ও অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে বৈঠক এবং কাজের বিশেষ মান নির্ণয় এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহন করা। আশা করা যায় গুজরাট ইকোলজি কমিশনের আওতায় গঠিত স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, প্রকল্প রূপায়ণকালে পরিবেশ দপ্তরের অধীন একটি উপকূল অঞ্চলের পরিচালন সংস্থায় পরিবর্তিত হবে। এই রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুসারে এই পরিবর্তন হবে।

তৃতিয় ভাগ : উড়িষ্যায় আই সি জেড এম প্রকল্পের রূপরেখা:

২৪) প্রকল্পের এই ভাগে রয়েছে- ক) রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংস্থা ও এবং প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের উপযুক্ত করে তোলা, যাতে করে উপকূল অঞ্চলের পলি আধার অনুসারে এই অঞ্চলের একটি সুসংহত পরিকল্পনা (আই সি জেড এম) তৈরী করা যায়। এর মধ্যে পারাদ্বীপ-ধামরা এবং আঞ্চলিক উপকূল পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা , সেই সঙ্গে বিশেষ সেল তৈরি করে পারাদীপ-ধামরা এবং গোপালপুর-চিল্কা অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত। খ) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার।

২৫) পারাদ্বীপ-ধামরা এবং গোপালপুর-চিল্কা এলাকায় আই সি জেড এম পরিকল্পনা: দ্বিতীয় ভাগে বর্নিত

পরিকল্পনার অনুরূপই এখানকার বিষয়বস্তু শুধু তফাৎ হল, ভিন্ন ধরনের ভূতাত্ত্বিক চরিত্র অনুযায়ী দু'টি আলাদা পরিকল্পনা তৈরি হবে। এটা মনে রাখতে হবে দু'টি নির্দিষ্ট উপকূল অঞ্চল একই পলি আধারে অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৬) উড়িষ্যার আই সি জেড এম ক্ষমতাবৃদ্ধি : উড়িষ্যায় এই প্রকল্পের জমি প্রস্তুত করতে বিভিন্ন দপ্তরের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা হবে। দপ্তরগুলি হল – বন ও পরিবেশ দপ্তর (যা উড়িষ্যা এস সি জেড এম এ'র সচীবালয়ও), উড়িষ্যা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (উপকূল অঞ্চলের পরিবেশ দূষনের দেখভাল এবং তার প্রতিরোধে সাহায্য করবে) এবং চিল্কা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (প্রজাতি ও জলাভূমি সংক্রান্ত গবেষনা)। অন্য বিভাগগুলিকে মধ্যবর্তীকালে প্রকল্পে সহায়তা করতে গ্রহন করা হবে।

২৭) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার: উড়িষ্যায় প্রকল্পের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ হবে মূলত দুটি ক্ষেত্রে যথা ১) গোপালপুর-চিল্কা এবং ২) পারাদীপ-ধামরা, বিস্তারিত নীচে দেওয়া হল- :

ক) উপকূল সম্পদের সংরক্ষন ও নিরাপত্তা - (১) চিল্কা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কর্তৃক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজপ্রাণী সংরক্ষন, (২) বন ও পরিবেশ দপ্তর কর্তৃক বাদাবন সৃজন , (৩) সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক ঐতিহ্যশীল ভবনগুলির সংস্কার যাতে সাইক্লোনের সময় এগুলি আশ্রয়স্থল হিসাবেও কাজ করে, (৪) জল-সম্পদ দপ্তর কর্তৃক পেন্থা গ্রামে উপকূলরেখা নিরাপত্তা নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক প্রকল্প।

খ) পরিবেশ এবং দূষন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা- (১) আবাসন ও নগরোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক পারাদীপ শহরের পরিবেশ পরিশোধন।

গ) উপকূলবাসীদের জীবনসংস্থানের নিরাপত্তা - (১) মৎস দপ্তর কর্তৃক চিল্কা হ্রদ ও গাহিরমাথা অভায়ারণ্যের কাছাকাছি এলাকার ৬০ টি মৎসজীবিদের গ্রামের মানুষকে সমধর্মী চাষাবাদে নিয়োজন, (২) পর্যটন দপ্তর কর্তৃক মৎসজীবিদের দলকে ছোট আকারের পর্যটন ব্যবসায় সহযোগিতা করা, (৩) শিল্প দপ্তর কর্তৃক মৎসজীবিদের বিকল্প ব্যবসা যেমন কয়্যার বানানো ইত্যাদিতে উৎসাহ প্রদান, (৪) দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর যে ১৩ টি উপকূলবর্তী গ্রামে যেখানে পূর্ববর্তী প্রকল্প থেকে সাইক্লোন শেল্টার বানানো হয়নি, সাইক্লোন শেল্টারের ব্যবস্থা করা।

২৮) প্রাথমিক বিনিয়োগ ও ক্ষমতাবৃদ্ধি একে অপরের পরিপূরক এবং একই উদ্দেশ্য সাধন করে। এরা একসাথে আই সি জেড এম প্রকল্পে উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চলের রক্ষনাবেক্ষনের কাজে আসবে।

২৯) প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট: এটি কর্মী নিয়োগ ও স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাজে সহায়তা করবে; যথেষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ বস্তুর ক্রয় সংক্রান্ত গবেষনা; তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কাজকর্মের রূপায়ণ; অভিযোগ গ্রহন ও তার প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা; গ্রহনযোগ্যতা ও শাসনতন্ত্র কায়েম; কাজের দেখভাল ও মূল্য নির্ধারণ; তৃতিয় পক্ষ দিয়ে হিসাব পরীক্ষা ও সামাজিক নীরিক্ষা; রাজ্যগুলির ও অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে বৈঠক এবং কাজের বিশেষ মান নির্ণয় এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহন করা। আশা করা যায় গুজরাট ইকোলজি কমিশনের আওতায় গঠিত স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, প্রকল্প রূপায়ণকালে পরিবেশ দপ্তরের অধীন একটি উপকূল অঞ্চলের পরিচালন সংস্থায় পরিবর্তিত হবে। এই রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুসারে এই পরিবর্তন হবে।

চতুর্থ ভাগ : পশ্চিমবঙ্গে আই সি জেড এম প্রকল্পের রূপরেখা:

৩০) প্রকল্পের এই ভাগে রয়েছে- ক) রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, যাতে করে আঞ্চলিক পলি আধার অনুসারে একটি সুসংহত পরিকল্পনা (আই সি জেড এম) তৈরী করা যায় এবং খ) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার।

৩১) পশ্চিমবঙ্গে আই সি জেড এম পরিকল্পনা: এর বিষয়বস্তু গুজরাটের পরিকল্পনার মতোই, শুধু ভিন্ন ধরনের ভূতাত্ত্বিক চরিত্র অনুসারে এখানে তিন ধরনের উপকূল অঞ্চল যথাক্রমে - সুন্দরবন সেক্টর, হলদিয়া সেক্টর এবং দীঘা-শঙ্করপুর সেক্টর- এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে এই তিনটি অঞ্চল বিভিন্ন পলি আধারের (সেডিমেন্ট সেলে) অন্তর্গত।

৩২) পশ্চিমবঙ্গের আই সি জেড এম' এর ক্ষমতাবৃদ্ধি : পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পের জমি প্রস্তুত করতে বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা হবে। দপ্তরগুলি হল – পরিবেশ দপ্তর (যা প:ব: এস সি জেড এম এ'র সচীবালয়ও), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (জৈবরসায়ন, পরিবেশ বিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, জৈব-কারিগরি বিভাগ) এবং ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রণমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ভূতাত্ত্বিক , ভূসংস্থান এবং জলাভূমি সংক্রান্ত গবেষনা এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সুন্দরবন রিসোর্স ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের কাজ শেষ করতে সহযোগিতা করা)। অন্য বিভাগগুলিকে মধ্যবর্তীকালে প্রকল্পে সহায়তা করতে গ্রহন করা হবে।

৩৩) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার: পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্পের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ হবে মূলত দুটি ক্ষেত্রে যথা ১) দীঘা-শঙ্করপুর এবং ২) সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে, যার বিস্তারিত দেওয়া হল- :

ক) উপকূল সম্পদের সংরক্ষন ও নিরাপত্তা - (১) বন দপ্তরের বাদাবন সৃজন, (২) সেচ দপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দীঘার সমুদ্র সৈকতে একটি প্রাথমিক প্রকল্প হিসাবে তটরেখা রক্ষা, (৩) সুন্দরবন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাগরদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে তটরেখা রক্ষা , বহুমুখী উদ্দেশ্যে সাইক্লোন সেন্টার নির্মান) (৪) জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক দীঘার মেরীন অ্যাকুরিয়্যামটির পুনর্বাসন।

খ) পরিবেশ এবং দূষন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা- (১) জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে দীঘা শহরের নিকাশি ও পরিবেশ পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপন, (২) দীঘা-শঙ্করপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কর্তৃক দীঘা সৈকত পরিচ্ছন্ন করা ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ প্রক্রিয়া, (৩) ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক মৎস নীলাম কেন্দ্রটির উন্নয়ন , (৪) রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানির দ্বারা সাগর দ্বীপের বিদ্যুতায়ন ও ডিজেল চালিত তাপ বিদ্যুতের ব্যবহার রোধ করে জল ও মাটির দূষণ রোধ করা।

গ) উপকূলবাসীদের জীবনসংস্থানের নিরাপত্তা - এই কর্মকান্ড সাগর দ্বীপে অনুসৃত হবে যথা- (১) মৎস দপ্তরের সহায়তায় মৎস আহরণ সংক্রান্ত পদ্ধতির উন্নয়ন, (২) বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন রকম জীবিকায় সহায়তা করা- বাজার ধরিয়ে দেওয়া, বন ধ্বংস না করে নানা জীবিকায় উৎসাহ প্রদান, এছাড়াও ছোট মাপের পর্যটন ও ইকোট্যুরিজমে সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক উৎসাহ প্রদান।

৩৪) প্রাথমিক বিনিয়োগ ও ক্ষমতাবৃদ্ধি একে অপরের পরিপূরক এবং একই উদ্দেশ্য সাধন করে। এরা একসাথে আই সি জেড এম প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চলের রক্ষনাবেক্ষনের কাজে আসবে।

৩৫) প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট: এটি কর্মী নিয়োগ ও স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের কাজে সহায়তা করবে; যথেষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিবিধ বস্তুর ক্রয় সংক্রান্ত গবেষনা; তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত কাজকর্মের রূপায়ণ; অভিযোগ গ্রহন ও তার প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা; গ্রহনযোগ্যতা ও শাসনতন্ত্র কায়েম; কাজের দেখভাল ও মূল্য নির্ধারণ; তৃতিয় পক্ষ দিয়ে হিসাব পরীক্ষা ও সামাজিক নীরিক্ষা; রাজ্যগুলির ও অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে বৈঠক এবং কাজের বিশেষ মান নির্ণয় এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহন করা। আশা করা যায় ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রণমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের আওতায় গঠিত স্টেট প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, প্রকল্প রূপায়ণকালে পরিবেশ দপ্তরের অধীন একটি উপকূল অঞ্চলের পরিচালন সংস্থায় পরিবর্তিত হবে। এই রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুসারে এই পরিবর্তন হবে।

৩৬) পরিবেশ ও সামাজিক পর্যালোচনার জন্য সম্পর্কিত সমীক্ষা: পরিবেশ ও বন মন্ত্রক নিম্নলিখিত কতগুলি সম্পর্কিত সমীক্ষা করেছে যার ফলাফল প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মূল্যায়ন ছাড়াও এই প্রকল্পকে প্রভাবিত করেছে। **(১)** বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকার মানচিত্র নির্মানে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তার গবেষণা। এই গবেষণা দেশের এই বিষয়ে ব্যাপৃত প্রতিষ্ঠানগুলির দেশের স্পর্শকাতর উপকূল অঞ্চল নির্ধারণে সক্ষমতা নির্ণয়ে সাহায্য করেছে**; (২)** ভারতবর্ষের উপকূল এলাকার পরিবেশ রক্ষায় বিগত ১০ বছরে উপকূল এলাকায় হওয়া নানা বিনিয়োগের উপযোগিতা যাচাই করতে সাহায্য করেছে। এই সমীক্ষার ফলে পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এই প্রকল্পের পরিচালন ব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করবে **(৩)** একটি সংযোগকারী ব্যবস্থার উপযোগীতা নিয়ে সমীক্ষা করা হয়**,** যা এই প্রকল্পের একটি প্রচারের রণনীতি নির্ধারনে সহায়তা করবে**; (৪)** উপকূলের বিপদরেখার মানচিত্র নির্মানের পদ্ধতি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ।

৩৭) এছাড়াও গুজরাট, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গও বেশ কিছু আলাদা গবেষণা করেছে, সেগুলি হল- (১) রাজ্য ভিত্তিক রিপোর্ট উপকূল অঞ্চলের প্রকৃতি , পরিচালন ব্যবস্থা, পরিস্থিতি উন্নয়নে কি কি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে তৈরি করেছে ; (২) আই সি জেড এম পরিকল্পনার জন্য একটি খসড়া বিধি প্রনয়ন ; (৩) প্রতিটি বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নিয়ে বিস্তারিত প্রোজেক্ট রিপোর্ট প্রকাশ প্রতিটি বিস্তারিত প্রকল্প বিবরণে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ মূল্যায়নের উপর একটি নির্দিষ্ট বিভাগ আছে ; (৪) রাজ্যগুলির উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন বাস্তুন্ত্র (গুজরাটে প্রবাল শৈলমালা, পশ্চিমবঙ্গে বাদাবন এবং উড়িষ্যার ক্ষেত্রে উভয়ই) নিয়ে আলাদা গবেষণা যা ইতিমধ্যে মূল্যনির্ধারন হয়ে যাওয়া গবেষণাগুলির পরিপূরকই হবে।

৩৮) আলাদা একটি পরিবেশ ও সামাজিক পর্যালোচনার জন্য সম্পর্কিত গবেষণা (তিরুবন্তপুরমের সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক) : এই প্রকল্পের জন্য গৃহীত প্রাকৃতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন পদ্ধতি একটি সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়গুলিকে মূল্যায়ন করেছে, এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিপদগুলি চিহ্নিত করেছে, এগুলি সম্ভাব্য প্রভাব এবং তার প্রতিকার ব্যবস্থাগ্রহনের সুপারিশ করেছে। দেশের ক্ষেত্রে ভারত সরকার একটি শুধুমাত্র বিধিনিষেধ সম্পন্ন ব্যবস্থা থেকে আই সি জেড এম নীতিতে উপকূলপরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও প্রকল্পটি নীতি বা আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরকম পরিবর্তন ঘটায়নি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পরিবর্তিত নীতি বা বিধিনিষেধ রূপায়নে সাহায্য করেছে। সেই কারনে বৃহৎ ক্ষেত্রে, পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়নের এই সমীক্ষা কার্যত বিধিনিষেধ সংক্রান্ত উপযোগিতা নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। এই সমীক্ষার ফলে কোন ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার প্রয়োজন আছে, এই প্রকল্পের ফলে বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিবর্তন এবং সেই সংক্রান্ত বিপদ, নীতি এবং বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে সেই বিপদগুলিকে আটকানো যায় কিনা- তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণার মূল প্রতিপাদ্যগুলি হল (১) উপকূল অঞ্চলের পরিকল্পনার জন্য একটি বিকেন্দ্রীভূত নীতি প্রনয়নের ফলে বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকাগুলির বিপদ ঘনিয়ে আসছে কিনা। কিন্তু নীতির ক্ষেত্রের প্রস্তাবিত পরিবর্তন বরং এই সব এলাকাগুলিকে আরে বেশী সংরক্ষিত করবে। (২) বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকাগুলির চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা নির্ধারণের প্রক্রিয়াকে প্রকল্পের মাধ্যমে আরও সুদৃঢ় করা এবং পরিবেশ মন্ত্রক দ্বারা এগুলির সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা। প্রসঙ্গতঃ এই জাতীয় স্পর্শকাতর এলাকাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বর্তমানে সংরক্ষিত নয়। আই সি জেড এম দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এই জাতীয় স্পর্শকাতর এলাকগুলির সংরক্ষনের ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান করার সুবিধা হবে। বর্তমানে শুধুমাত্র আইন করে সংরক্ষনের চাইতে এই জাতীয়

ব্যবস্থা সুবিধাজনক হবে। (৩) আরও একটি ব্যাপার অনুধাবন করা যে এই প্রকল্পের ফলে উপকূল এবং সামুদ্রিক অঞ্চলের সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উপকূলবাসীদের যাতে ব্যাঘাত না হয়। উল্লেখ্য , ঐতিহ্য এবং প্রথাগতভাবে এই সমস্ত উপকূলবাসীদের জীবনসংস্থান এই সম্পদের উপর নির্ভরশীল। আবার দেখতে হবে যে এই সমস্ত সম্পদের উপর উপকূলবাসীদের অধিকার বিচ্যুত না হয় বা সমাজের উপর তলার মানুষের দ্বারা অধিকৃত না হয়। এছাড়াও ভারত সরকারের উপকূল অঞ্চলের সকল স্বার্থরক্ষাকারী অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ এবং এই কাজে যুক্ত করা সুনিশ্চিত করবে, (বিশেষতঃ সেই বিপদাপন্ন অংশকে যারা উপকূলের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল)। এর ফলে এই অঞ্চলের সম্পদের উপর উপকূলবাসীদের সম এবং ঐতিহ্যগত ব্যবহারের অধিকার আই সি জেড এম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হবে। ক্ষুদ্র স্তরে এই পরিকল্পনা তৈরী করার সময় এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মূল্যায়নের সময় প্রকল্পের ফলে স্থানীয়ভাবে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিভাবে এই জাতীয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে যাওয়া বা মোকাবিলা করার ব্যবস্থাপনার কথা ভাবা হয়েছে।

৩৯) ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্থায় যেখানে উপকূল অঞ্চলের পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষনা করা হয়েছে তার বিভিন্ন বিবরণের পর্যালোচনা করেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট বানানো হয়েছে। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগগুলির বিশদ বিবরণ , রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পের বিবরণ যার মধ্যে নিজ নিজ রাজ্যের নির্দিষ্টভাবে উপকূলের সমস্যাগুলি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্য্য বর্ণিত আছে এবং এই সমস্ত রাজ্যগুলি সরাসরি ভাবে ভ্রমন ও বিনিয়োগের স্থানগুলি পরিদর্শন করে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মূল্যায়ণ সংক্রান্ত রিপোর্ট বানানো হয়েছে। এছাড়াও প্রধান স্বার্থযুক্ত অংশীদার এবং এই সমস্ত রাজ্যগুলির উপকূল অঞ্চল পরিচালনার জন্য বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং অন্যান্য সংযুক্ত দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান এবং যারা উপকূল অঞ্চলে কাজ করে - তাদের সবার সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই এই আধিকারিকদের সাথেও আলোচনা করা হয়েছে। আই সি জেড এম - এর নীতি অনুযায়ী প্রাকৃতিক ঝুঁকিগ্রস্ত উপকূলবাসী যেমন আদিবাসী জনজাতি এবং ঐতিহ্যগতভাবে বসবাসকারী মানুষেরাই সব চাইতে বেশী উপকীত হবেন। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাগুলি কিভাবে স্থানীয় উপকূলবাসীদের মধ্যে বন্টন করা যায় - তা নিয়েও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নীতি, নিয়ন্ত্রনের কাঠামো এবং সম্মতি

৪০) সংবিধান অনুসারে: ভারতে ত্রিস্তরের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। মাথায় রয়েছে কেন্দ্র সরকার, মাঝে রাজ্য সরকার, আর একেবারে নীচের স্তরে রয়েছে গ্রামীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সংবিধানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তালিকা বর্তমান। ভারতীয় সংবিধানে একাদশ পর্বে কেন্দ্র ও রাজ্যের এই প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। সংবিধানের ২৪৬ নম্বর ধারায় সাংবিধানিক বিষয়ের তিনটি তালিকাও দেয়া আছে যা কেন্দ্র, রাজ্য এবং যৌথ তালিকার কথা বলা আছে। যদি কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরাকারের আইন যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য সরকারের আইনের সাথে বিবাদ হয় , সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনই প্রযোজ্য হবে। ভারতে পরিবেশ বিধি ও নিয়ন্ত্রনে উপকূল রক্ষার বিষয়টি বিশেষভাবে আলাদা গুরুত্ব পেয়েছে। উপকূলবর্তী অঞ্চলে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নীতি ও আইনে এই অঞ্চলকে নির্দিষ্ট জোন বা বলয়ে ভাগ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপকূল অঞ্চলের উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি (যে গুলিতে ভারত সরকার অংশীদার) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়াও আঞ্চলিক উন্নয়নের

জন্য যেমন নীতিও বিধান রয়েছে তেমনি ঐ সমস্ত অঞ্চলের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্যও আলাদা আইন রয়েছে।

৪১) ভারতের সাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সমঝোতাপত্র ও কনভেনশান: ভারত পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছে ও সমঝোতা পত্রে সাক্ষরও করেছে। এই সমস্ত অঙ্গীকারকে রক্ষা করার জন্য অনেকে উদ্দোগও নিয়েছে, এই প্রকল্প সেই সব সমঝোতা পত্রে ভারতের সম্মতির নিদর্শন হিসাবেও দেখা যেতে পারে।

৪২) উপকূল অঞ্চল ও সামুদ্রিক এলাকা বিষয়ক জাতীয় নীতি : ভারতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বেশ কিছু উপকূল ও সামুদ্রিক এলাকা বিষয়ক নীতি রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সেগুলি তৈরী করা হয়েছে এই সংক্রান্ত প্রধান নীতিগুলি হল- ন্যাশানাল ওয়াটার পলিসি ১৯৮৭, ২০০২ ; ন্যাশানাল ফরেস্ট পলিসি ১৯৮৮ ; ডীপ সি ফিশিং পলিসি ১৯৯১ ; পলিসি স্টেটমেন্ট অন অ্যাবাটমেন্ট অফ পলিউশান ১৯৯২ ; টুরিজম পলিসি ১৯৯৮ ; ন্যাশানাল এগ্রিকালচার পলিসি ২০০০ ; মেরীন ফিশিং পলিসি ২০০৪ ; ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্ট পলিসি ২০০৬ ; ন্যাশানাল রিহ্যাবিলিটেশান অ্যান্ড রিসেটলমেন্ট পলিসি ২০০৭। এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে যাতে প্রকল্পের সঙ্গে এগুলির কোন দ্বন্দ্ব না থাকে এবং দেখা গেছে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

৪৩) আইনি ও নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো: উপকূল এলাকার জন্য বেশ কিছু আইন রয়েছে সেগুলি হল - ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট ১৮৯৪ ; ইন্ডিয়ান ফিশারিজ অ্যাক্ট ১৮৯৭, ইন্ডিয়ান পোর্টস অ্যাক্ট ১৯০৮ ; কোষ্ট গার্ড অ্যাক্ট ১৯৫০ ; মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট ১৯৫৮ ; দ্য মডেল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অ্যাক্ট ১৯৬০ ; মেজর পোর্ট ট্রাষ্ট অ্যাক্ট ১৯৬৩ ; ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৭২ (২০০২ সালে সংশোধিত) ; ওয়াটার (প্রিভেনশান অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশান) অ্যাক্ট ১৯৭৪ ; মেরীটাইম জোনস্ অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (উপকূলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিদেশী জলযানের উপর বিধি নিষেধ) ১৯৭৬, সমুদ্রে মৎস শিকার সংক্রান্ত আইন, ১৯৭৮ ; বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০ (৮৮' তে সংশোধিত) ; এয়ার (প্রিভেনশান অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশান) অ্যাক্ট ১৯৮১ ; এনভায়রণমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৮৬ ; হ্যাজার্ডাস ওয়াস্ট (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হ্যান্ডলিং) রুলস্ ১৯৮৯ ; কোষ্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন ১৯৯১ ; ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্ট ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট ১৯৯৫ ; ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্ট অ্যাপেলেট অথোরিটি অ্যাক্ট ১৯৯৫ ; বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট ২০০২ ; এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট নোটিপিকেশন ২০০৬ ; শিডিউল্ড ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ট্র্যাডিশনাল ফরেষ্ট ডোয়েলারস অ্যাক্ট (বনের অধিকার সম্পর্কিত স্বীকৃতি), ২০০৬ ; ন্যাশানাল রিসেটলম্যান্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন পলিসি ২০০৭ ; ও প্রোপোজড ল্যান্ড অ্যাকুজিশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসেটলমেন্ট বিল। এছাড়াও রাজ্যগুলিতে রয়েছে গুজরাট ফিশারিজ অ্যাক্ট ২০০৩ ; উড়িষ্যা মেরীন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলস ১৯৮২ উড়িষ্যা পুনর্বাসন নীতি ; পশ্চিমবঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেরীন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অ্যান্ড রুলস ১৯৯৫। এই প্রকল্পের প্রতিটি আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যেখানে যেটি প্রযোজ্য।

৪৪) প্রকল্পের জন্য বিধিবদ্ধ ছাড়পত্র: এই প্রকল্প পরিকল্পিত হয়েছে কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন ১৯৯১ এর নিয়ম মেনে। এছাড়াও প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে স্টেট কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ডিসেম্বর ২০০৯ এর মধ্যে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অংশকে অনুমোদন দেবে। গোটা প্রকল্পের জন্য ন্যাশানাল কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি জানুয়ারী ২০১০ এর মধ্যে অনুমোদন করবে। প্রকল্পের অন্তর্গত একটি বিশেষ কাজ হল উড়িষ্যার পারাদ্বীপ অঞ্চলে বর্জ্য পদার্থ দ্বারা জমি উঁচু করা এবং তার পরিশোধণ করা। এই কাজের জন্য এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট নোটিফিকেশন ২০০৬ মোতাবেক বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন আছে। এই কাজ শুরু হওয়ার বহু আগে ২০১০ এর জানুয়ারী মাসের মধ্যে এই অনুমতি পাওয়া যাবে।

৪৫) বিশ্ব ব্যাঙ্কের নীতি প্রযোজ্য: এই প্রকল্পের জন্য নিম্নলিখিত বিশ্বব্যাঙ্কের পরিবেশ ও সামাজিক রক্ষাকবচ নীতি প্রযোজ্য হবে- (১) পরিবেশের পর্যালোচনা OP 4.01, (২) প্রাকৃতিক বাসস্থান OP 4.04, (৩) স্বদেশী জনগন, OP 4.10, (৪) সাংস্কৃতিক সম্পদ , OP 4.11, (৫) স্বেচ্ছা পূনর্বাসন, OP 4.12, এবং (৬) অরণ্য, OP 4.36। এই প্রকল্পটি এই সমস্ত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরী করা হয়েছে।

স্বার্থজড়িত অংশীদারদের পরামর্শের প্র ক্রিয়া:

৪৬) এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট হল এতে স্বার্থজড়িত অংশীদারদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে নানা আলোচনা ও বৈঠকের পর তাদের বক্তব্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সেখান থেকে এর নানা ধরনের গুনাগুন আহরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে আছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ মূল্যায়নকারী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন ধরনের কমিটির সঙ্গে আলোচনা, খসড়া সি এম জেড নোটিফিকেশন ২০০৮ সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা থেকেও বেশ কিছু উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪৭) রাজ্যে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নিয়েও স্বার্থজড়িত অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শগুলি যেভাবে সাজানো হয়েছে- (১) এক বিশাল অংশের জনগন, জনজাতি এমনকি বেশ কিছু বিশেষ ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সামিল করা গেছে ; (২) প্রকল্প স্থলের আশেপাশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার বিভিন্ন পদ্ধতি খতিয়ে দেখা হয়েছে ; (৩) প্রকল্পের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে এর সুফলগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ, বিকল্প, উপকারিতা এবং অধিকার (যেখানে প্রযোজ্য)- ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে ; (৪) জনগোষ্ঠীর মতামত (যেখানে কারিগরি ভাবে সম্ভব) এবং দৃষ্টিভঙ্গী জেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আহৃত ফল এই প্রকল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে করা হয়েছে।

৪৮) সি আর জেড ও সি এম জেড নোটিফিকেশন গঠনের জন্য পরামর্শ চলছে: –স্বামীনাথন কমিটির রিপোর্টে উল্লেখিত আছে যে এটি প্রাথমিক স্তরে বিস্তৃতভাবে স্বার্থজড়িত অংশীদারাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখে তৈরী হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনায় প্রাথমিক স্তরে উঠে এসেছে যে সি আর জেড নোটিফিকেশনটি নানা করানে বহুবার শিথিল ও সংশোধন করা হয়েছে (প্রায় ২৫ বার) এবং প্রতিবারই কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য এটি করা হয়েছে যা মৌলিক পরিবেশ রক্ষা আইন ১৯৮৬ এর উদ্দেশ্যের এবং সি আর জেড আইনের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে খাপ খায়না। এই নেটিফিকেশনকে স্বচ্ছতার সঙ্গে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলবৎ করার বিষয়েও বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নোটিফিকেশনে মৎসজীবিদের (যারা এই উপকূলের সম্পদের উপর নির্ভরশীল) স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিতে আরও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪৯) এছাড়াও আর নানা পরামর্শ ও মন্তব্য খসড়া নোটিফিকেশনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের কাছে এসে পৌছেছে। খসড়া সি এম জেড নোটিফিকেশন ২০০৮ এর উপর সংগৃহিত বিভিন্ন পরামর্শ ও মন্তব্যকে খতিয়ে দেখার জন্য পরিবেশ মন্ত্রক আবার অধ্যাপক স্বামীনাথনের নেতৃত্বে একটি উচ্চস্তরের কমিটি তৈরী করেছিল , এই কমিটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রককে এই নোটিফকেশনের নীতি ও আইনি কাঠামো নিয়ে পরামর্শ দিয়েছে। এর পর পরিবেশ ও বন মন্ত্রক খসড়াটির উপর একটি পর্যালোচনা করে সি আর জেড নোটিফিকেশন ১৯৯১ মূল কাঠামোর সঙ্গে কিছু নতুন প্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত করে জলবায়ুর পরিবর্তন ও সমুদ্র তলের উচ্চতা বৃদ্ধি ; জন বিস্ফোরণের চাপ ; প্রাকৃতিক সমুদ্র প্রসকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্রের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করবে , তাকে মাথায় রেখে

উপকূল অঞ্চলের জন্য একটি নতুন নোটিফিকেশন তৈরী করবে।

৫০) রাজ্য স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে খসড়া সি এম জেড নোটিফিকেশন বিষয়ে আলোচনা: বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আধিকারিকেরাও বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সহ বিপদরেখার চিহ্নিতকরণের বিষয়টিতে ইতিবাচক মতামত পেশ করেছেন। তারা বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপর নির্ভরশীল হবার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন, যদিও রিটার্ণ ইন্টারভ্যাল বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সরকার সেটব্যাক লাইনের পরিবর্তে বিপদ রেখা চিহ্নিতকরণ (হ্যাজার্ড লাইন) বিষয়ে ধারনাকে স্বাগত জানিয়েছেন, এবং পাঁচ থেকে দশ বছর পর এর একটি পর্যালোচনা হওয়ারও প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। বেশির ভাগ উপকূলবর্তী রাজ্যগুলি বর্তমান সি আর জেড নিয়মকে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে বজায় রাখার সুপারিশ করেছে। স্বামীনাথন রিপোর্টে উল্লেখিত 'পার্টিসিপেটরি ম্যানেজমেন্ট' এর উপর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা জোর দিয়েছেন। বিপদ রেখা চিহ্নিতকরণ বা সি এম জেড নোটিফিকেশন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রূপায়িত হবার পূর্বেই হওয়ার দরকার বলে তারা মনে করেছেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি স্থানীয় সরকারের স্বার্থে তাদের হাতে আরও ক্ষমতা আই সি জেড এম অনুসারে দেওয়ার দাবি রেখেছে। সেই সঙ্গে রাজ্য স্তরের উপকূল রক্ষনাবেক্ষণ অথরিটি আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের কাছে রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি খসড়া সি এম জেড নোটিফিকেশন নিয়ে পরামর্শ ও আপত্তি জানিয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছে।

৫১) প্রস্তাবিত সি এম জেড নোটিফিকেশন নিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রক নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা: গত জুলাই থেকে আগষ্ট ২০০৮ পর্যন্ত সেন্টার ফর এনভায়রণমেন্ট এডুকেশন (সি ই ই) ১৩ টি উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩৫ টি মতবিনিময় বৈঠকের আয়োজন করেছে। স্থানীয় প্রতিনিধিরা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও এই বৈঠকগুলিতে অংশগ্রহন করেছিল। এই নিয়ে একটি রিপোর্ট সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রকে জমা পড়েছে। সেন্টারের রিপোর্ট অনুসারে যে সব মুখ্য বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হলো- (১) কোষ্টাল রেগুলেশন জোন কে রেখে দিয়ে উন্নয়নের বিষয়টি যুক্ত করা ; (২) সেট ব্যাক লাইন, বাস্তুসংস্থান অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকা নির্ধারণ, আই সি জেড এম, প্রণালী ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে আরও অনেক স্বচ্ছ ধারনা সৃষ্টি ; (৩) সি আর জেড নোটিফিকেশন ১৯৯১ এর উন্নতি ও এর উলঙ্ঘনকে শাস্তি যোগ্য করা ও অবিলম্বে এর ব্যবস্থাপনাকে লাগু করা, প্রসঙ্গত সি আর জেড নোটিফিকেশনের মধ্যেই এই জাতীয় ব্যবস্থা নেবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ; (৪) খসড়া সি এম জেড নোটিফিকেশন ২০০৮ তৈরী করতে স্বার্থজড়িত অংশীদার বিশেষত স্থানীয় বাসিন্দাদের যুক্ত করা ; (৫) এই নতুন প্রণালীর অন্তর্ভুক্তিতে স্থানীয় মানুষের কথা না ভেবে যাতে কর্পোরেট কর্মকান্ডকে আইনসিদ্ধ করা বা স্পেশাল ইকনমিক জোনকে গুরুত্ব দেওয়া না হয় সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা ; (৬) স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য সরকারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে সি এম জেড নোটিফিকেশন ২০০৮ এ সব ধরনের পরিকল্পনার সময় পাশে রাখার প্রচেষ্টা, ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও পরিকাঠামো সৃষ্টি করা যাতে করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বিশেষতঃ পঞ্চায়েত সদস্যরা এলাকার পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও রূপায়নে অংশ গ্রহন করতে পারে ; (৭) উপকূল এর পরিবেশ রক্ষায় ও উপকূলবাসীদের মৌলিক অধিকার , কৃষ্টি সংস্কৃতি ও জীবন জীবিকা রক্ষার প্রশ্নে একটি প্রশাসনিক বিধান বা আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। এই আইন প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বিধানসভায় উপকূল সংক্রান্ত নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

৫২) প্রকল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকে আলোচনা: পরিবেশ ও বন মন্ত্রক কর্তৃক প্রকল্পের নানা বিষয়বস্তু ও উপকূল রক্ষার নানা দিক নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময়ের আয়োজন করেছে। যার মধ্যে আছে বিপদরেখা চিহ্নিতকরনের পদ্ধতি ও উপাদান, বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্পর্শকাতর এলাকার নির্বাচন (কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

এই কাজ করা হবে এবং ভারতবর্ষের উপকূল ভাগকে সুসংহতভাবে পরিচালনা করার মতো সক্ষমতা। এর জন্য একটি জাতীয় স্তরের কর্মশালার আয়োজন ও বেশ কিছু দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সমাহারে মগজে ঝড় তোলা আলোচনা ও বেশ কিছু আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পে অংশগ্রহনকারী তিনটি রাজ্য যথাক্রমে গুজরাট, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি ও স্বার্থজড়িত অংশীদারদের সঙ্গেও বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নানা সংস্থা ও স্বার্থজড়িত অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যই এগুলি আয়েজিত হয়েছে। যে সমস্ত বিভিন্ন বিষয় এই ধরনের আলোচনাগুলিতে উঠে এসেছে, প্রকল্প তৈরী করার সময়, রাজ্যস্তরের রূপায়নে সংস্থাগুলি বাস্তব সম্মত ভাবে প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৫৩) প্রকল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে যোগাযোগ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কর্তৃক আলোচনা : প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও উপকূল এলাকার মানুষদের মধ্যে এর গ্রহনযোগ্যতা বাড়াতে এবং স্বার্থহড়িত অংশীদারদেরও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রক নিযুক্ত পরামর্শদাতারা প্রকল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রকল্প সংক্রান্ত ভুল ধারনা কাটিয়ে তোলা এবং সুসংহত পরিকল্পনা বা আই সি জেড এম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি দ্বিমুখী আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প আধিকারিকদের প্রকল্প তৈরী ও রূপায়নে সাহায্য করা, কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরের প্রকল্প রূপায়নকারী সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম করতে সাহায্য করা ; প্রকল্প তৈরী এবং রূপায়নের সময় জনসাধারণকে জানানো এবং প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে সেই সমস্ত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি গ্রহনে সাহায্য করা ; এই আলোচনায় যা উঠে এল- (১) সকল সংবাদপত্রে সি এম জেড খসড়া নোটিফিকেশন এবং আই সি জেড এম পি নিয়ে খুব অল্পই খবর হয়েছে ; (২) অনেক নিয়মই উপকূল এলাকার সারারণ মানুষের বোধগম্য হয়নি ও বিশেষতঃ মৎসজীবি মানুষের ভাবনা চিন্তারও প্রতিফলনও হয়নি ; (৩) এই প্রকল্পের ফলে যে তাদের জীবন জীবিকা রক্ষা পাবে এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থতা ; (৪) সি আর জেড ক্যাটাগরী থেকে সি এম জেড জোনে পরিবর্তনের তথ্য নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ধোঁয়াসা ; (৫) বিভিন্ন অভিযোগের যাথার্থতা বিচারে ঘাটতি, প্রকল্প রূপায়ণে স্বচ্ছতার উপরও জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে বিভিন্ন স্বার্থজড়িত অংশীদারদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবটি গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে।

৫৪) পরিবেশ ও সমাজ বিষয়ে প্রকল্প নিয়ে তিনটি রাজ্যর সঙ্গে আলোচনা: পরামর্শদাতাদের (সি ই ডি) রাজ্য স্তরের নানা দপ্তর যথা বন, পরিবেশ, মৎস্য, জলসম্পদ ইত্যাদি এবং স্বার্থজড়িত অংশীদারদের যেমন মৎস্যজীবি, নৌকায় কর্মরত শ্রমিক, অন্যান্য উপকূলবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মূল উদ্দেশ্য হল প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যাগুলি খুঁজে বের করে তার প্রতিবিধান করা। এই ক্ষেত্রে মূল সমস্যা যেগুলি নির্ধারিত হয়েছে-

ক) **গুজরাট: (**১) শহরের ময়লা জল জমা করা**,** শোধন এবং নিরাপদ নির্গমনের সময় জামনগরের প্রস্তাবিত স্যুয়ারেজ ট্রীটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে জলাভূমি ও জমির দূষণ **; (**২) এসটিপি**,** ল্যাবরেটরী ভবন ইত্যাদি নির্মানের জন্য জল**,** বায়ু ও শব্দ দূষনের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান **; (**৩) প্রকল্পের জমিটিতে স্থানীয় অধিবাসীরা বেআইনি ভাবে ভোগ করত ; এক মরশুমের জন্য চাষাবাদ করত ; যদিও এখন তারা স্বেচ্ছায় উঠে গেছেন ; কিন্তু তা নিয়ম মেনে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন ; (৪) বাদাবন সৃজন, বিভিন্ন ইকোসিস্টেম প্রণয়ন ও নানা আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিভিন্ন স্বার্থজরিত অংশীদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে ; (৫) প্রবাল প্রতিস্থাপনে শৈলমালা ও প্রাথমিক বাস্তুসংস্থানে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে এর ফলে বর্তমান প্রবাল শৈলমালার বৃদ্ধি প্রতিহত হতে পারে এবং কোন একটি প্রজাতির কর্তৃত্বের ফলে জীববৈচিত্র নষ্ট হতে পারে ; (৬) দূষণ যদি প্রতিরোধ না করা যায় প্রতিস্থাপিত প্রজাতির অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিতে পারে ; (৭) ইকোট্যুরিজমের কাজ যদি সঠিক ভাবে

পরিকল্পিত ও রূপায়িত না হয় তবে জল, বায়ু ও শব্দ দূষণ ঘটবে এবং জীববৈচিত্রে সমস্যা দেখা দেবে ; (৮) ম্যানগ্রোভের সঠিক রক্ষনাবেক্ষন না হলে স্থানীয় কিছু প্রজাতির ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ; (৯) ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ঠিক ঠাক বিপণনের ব্যবস্থাও চাই।

খ) **উড়িষ্যা:** (১) উপকূল রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন সময় সৈকতে বালি ব্যাগে ভরে বাঁধ তৈরি হয় এর ফলে উপকূলের ভূচরিত্রের ক্ষতি এবং কাছে পিঠের অন্য অরক্ষিত সৈকতের স্থায়িত্বের ক্ষতি করতে পারে ; (২) প্রতিরক্ষা ও ল্যাবরেটরী সহ নানা কারনে যে সব নির্মান হচ্ছে সেগুলি যদি সঠিক স্থানে সঠিক ভাবে না হয়, নির্মানকালে জল, বায়ু ও শব্দ দূষণের সম্ভাবনা থাকবে; (৩) নির্মানকার্য্য ঠিক ভাবে বা পরিকল্পিত হলে রাস্তায় সাময়িক বাধার সৃষ্টি করতে পারে; (৪) বিভিন্ন ইকোসিস্টেম প্রণয়ন ও নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বিভিন্ন স্বার্থজড়িত অংশীদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে; (৫) ইকোট্যুরিজমের কাজ যদি সঠিক ভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত না হয় তবে জল (নৌকা থেকে তেল জলে মিশে) , বায়ু ও শব্দ দূষণ ঘটবে এবং জীববৈচিত্রে সমস্যা দেখা দেবে; (৬) ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ঠিক ঠাক বিপণনের ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাও চাই (৭) বাদাবন সৃজন যদি ঠিক ভাবে না হয় স্থানীয় অনেক প্রজাতির ক্ষতি হতে পারে ; (৮) ইকোট্যুরিজম এলাকায় কঠিন বর্জ্য অপসারনকে সবচাইতে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে ; (৯) কঠিন বর্জ্য পরিবহনের সময় কাছাকাছি এলাকায় দূষণ ছড়াতে পারে।

গ) **পশ্চিমবঙ্গ:** (১) শহরের ময়লা জল জমা করা, শোধন এবং নিরাপদ নির্গমনের সময় স্যুয়ারেজ ট্রীটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে জলাভূমিতে জমির দূষণ , পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূগর্ভস্থ জলে দূষণ হতে পারে ; (২) উপকূল রক্ষার তাগিদে বিভিন্ন সময় সৈকতে বালি ব্যাগে ভরে বাঁধ তৈরি হয়, এর ফলে উপকূলের ভূচরিত্রের ক্ষতি এবং কাছে পিঠের অন্য অরক্ষিত সৈকতের স্থায়িত্বের ক্ষতি করতে পারে; (৩) আরসিসি এর মাধ্যমে নিরপত্তা বিধান সামুদ্রিক জৈববৈচিত্রে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাঘাত করতে পারে; (৪) নিকাশি ব্যবস্থা নির্মান, এস টি পি, ইলেকট্রিফিকেশন ও ইকোট্যুরিজমের কাজ যদি সঠিক ভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত না হয় তবে জল, বায়ু ও শব্দ দূষণ ঘটবে; (৫) নির্মানকার্য্য ঠিক ভাবে বা পরিকল্পিত হলে রাস্তায় সাময়িক বাধার সৃষ্টি করতে পারে; (৬) কারা দোকান ইত্যাদির মাধ্যমে পুনর্বাসন পাবেন, ইকোট্যুরিজম, বনসৃজন এবং বিকল্প আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কারা লাভবান হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন স্বার্থজড়িত অংশীদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে; (৭) ইকোট্যুরিজমের সঙ্গে ঠিক মতো বিপণনের ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাও চাই; (৮) বনায়নের কাজ ঠিক ভাবে না হলে অনেক স্থানীয় প্রজাতির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে; (৯) মাছের পাইকারী বাজার থেকে জলাজমি দূষণ হতে পারে; (১০) ইকোট্যুরিজমের কাজ যদি সঠিক ভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত না হয় তবে জল, বায়ু ও শব্দ দূষণ ঘটবে এবং জীববৈচিত্রে সমস্যা দেখা দেবে; (১১) উৎসবের সময় পর্যটক সমাগম এবং কঠিন বর্জ্য অপসারণ ইত্যাদির কারনে দূষন হয়, এরজন্য বিশেষ উদ্দোগ নেওয়া দরকার।

৫৫) গুজরাট, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন গোষ্ঠী, ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরিবেশ ও বন মন্ত্রক এবং আরও অতিরিক্ত আলোচনা : এই প্রতিটি রাজ্যের রাজধাণীতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হয়েছে। সর্বমোট ১২২ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গোষ্ঠী সংস্থার (জাতীয় স্তরে ৮৬ টি, গুজরাটে ২২ টি, উড়িষ্যায় ১৪ টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৮ টি) এবং ১১৮ জন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৮ এর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। প্রকল্প চুড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে স্বার্থজড়িত অংশীদারদের সঙ্গে আরও একটি আলোচনা যথাক্রমে নয়া দিল্লি, গান্ধীনগর , ভুবনেশ্বর ও কলকাতায় ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে জানুয়ারী ২০১০ এ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও নিরন্তর আলোচনা প্রকল্প চলাকালে ঘটতেই থাকবে।

বিকল্প পর্যালোচনা

৫৬) বিকল্প পর্যালোচনা সমগ্র প্রকল্পের পরিকল্পনায় যুক্ত করা হয়েছে: (১) প্রকল্পকে এভাবে সাজানো হবে যাতে খুব কম বিনিয়োগে উপকূলবাসীদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা যায়, বাসস্থানের নিরাপত্তা দেওয়া যায়, দূষণ নিয়ন্ত্রন করা যায়, যাতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সম্পদের দীর্ঘমেয়াদের উপর লক্ষ্য রেখে এই প্রকল্প করা হবে (যেমন প্রবাল শৈলমালাকে রক্ষা করা যাবে না যদি না ঐ অঞ্চলে ময়লা জলের নিস্কাশন থামানো যায়।) ভারত সরকারের প্রস্তাবিত সংস্কারে যাতে সায় না দেয় এবং অল্প কিছু ক্ষেত্রে হলেও অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করে কাজ করবে। (যেমন পরিবেশ মন্ত্রকের শহরাঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থা আয়ত্তাধীন নয় বা অন্য অন্যান্য বিষয় যেগুলির জন্য উপকূলের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে) ; (২) প্রকল্পের সিংহভাগ বিনিয়োগই উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষনাবেক্ষনের পরিকাঠামো গড়তে ও যোগসূত্র-মূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যয় করা হবে। (৩) শুধুমাত্র প্রকল্পটিকে প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও মূলত জাতীয় স্তরে যতটা সম্ভব রাজ্যগুলির উপকূল অঞ্চলের সংরক্ষনে আলাদা মডিউল তৈরি করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। এটি পরিত্যক্ত হয়েছে কারন উপকূল অঞ্চলে এটি খুব সামান্যই কাজে আসবে বলে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক স্তরের মতো আই সি জেড এম পন্থা থেকেও সরে যাবে এবং ভারত সরকারের এই জাতীয় কাজের জন্য অনুরোধও করেনি।

৫৭) তিনটি রাজ্য নির্বাচন, উপকূল নির্বাচন এবং বিনিয়োগের অগ্রাধিকার : রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে উপকূল অঞ্চলের বিকেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থাকে মাথায় রেখে ভারত সরকার যে ইচ্ছা এবং আগ্রহ প্রকাশ করেছিল - তার ভিত্তিতেই এই নির্বাচন করা হয়েছে। ভারতে ভূমি ও জল উভয়ই রাজ্যের বিষয় , আর ভারত সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে সামনে রেখে শুধু মাত্র জাতীয় স্তরে কোনরকম সংরক্ষন বা উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করা যায় না। তাছাড়া কেন্দ্র নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে পারে, কিন্তু তা লাগু করা স্থানীয় প্রশাসনের হাতে, আই সি জেড এম পরিকল্পনা রূপায়ন করার জন্য কোন প্রকল্প কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারেনা যদিনা রাজ্য / স্থানীয় স্তরে এর উদ্যোগ না নেওয়া হয়। আর আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে আই সি জেড এম এর ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনকে যুক্ত না করলে এই পরিকল্পনা সফল হয়না। তাই এই প্রকল্পে রাজ্যগুলিকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৫৮) বিনিয়োগের অগ্রাধিকার ঠিক করার আগে সংশ্লিষ্ট স্বার্থজড়িত অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা বিবেচনা করে করা হয়েছে। এখানেই উঠে এসেছে যে বাস্তুতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষন , উপকূলবাসীদের জীবিকার উন্নয়নের স্বার্থে কার্য্যকলাপ, প্রথাগত জীবিকা যারা বদলেছেন তদের জন্য বিকল্প জীবিকার পথ দেখানো এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন বা বন্ধ করা। এর জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, গোষ্ঠীগত অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করা, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা এবং দারিদ্র সহ অন্য সমস্যাগুলিকে খুঁজে বের করা। বিনিয়োগের অগ্রাধিকারের প্রতিটি বিষয়ই ঠিক করা হয়েছে যাতে করে প্রাকৃতিক পরিবেশগতএবং আর্থিক ও মানব সম্পদের যথার্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত দিকগুলি স্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয়। এই প্রকল্পের বিকল্পগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে খতিয়ে দেখা হয়েছে : -

ক) যে সমস্ত রাজ্যগুলি প্রাথমিক ভাবে নির্যাচিত হয়েছে। সেগুলিতে অনেক বেশী প্রকৃতিগত জটিলতা বর্তমান যার মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব বিরাজমান। ফলে অনেকবেশী বিরূপ প্রতিক্রিয়া বর্তমান।

খ) প্রাথমিক বিনিয়োগগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে সেই সব জায়গাতেই যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়সূত্র খুবই দৃঢ়। যা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান ভান্ডারকে অভিষ্ট আই সি জেড এমে রূপান্তরে সহায়তা করবে।

গ) রাজ্য সরকারগুলিই পরিবেশের নানা সমস্যা বিবেচনা করে এবং অগ্রাধকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট উপকূল অঞ্চল নির্বাচন করেছেন।

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা :

৫৯ একটি বিস্তারিত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে রিপোর্টিং এর দায়িত্ব ও প্রকল্পের নানা বিষয়বস্তুর উপর নজরদারির বিষয়টিকে মাথায় রেখে। প্রতিটি উপবিভাগকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে করে দীর্ঘমেয়দি সুফল লাভ করা যায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিও স্থায়ী হয় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া বন্ধ করা যায়। এই পরিকল্পনায় রয়েছে (১) কড়া নজরদারি যাতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা না হয় ; (২) সুষ্ঠু সমাধান ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ; (৩) তৃতিয় পক্ষের মাধ্যমে বিচার ও নজরদারি যার মধ্যে সামাজিক বিষয়গুলিও দেখা হবে ; (৪) অভিযোগের সমাধান প্রক্রিয়া ; (৫) যথেষ্ট ব্যয় বরাদ্দ ; (৬) প্রকল্প রূপায়ণে যথেষ্ট কর্মী নিয়োগ।

৬০) প্রকল্পের অঙ্গসজ্জায় পরিবেশ সম্বন্ধীয় বিষয়ের সমন্বয়: এই প্রকল্প উপরিলিখিত বিভিন্ন পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলিতে ভারত সরকারের উপকূল রক্ষার ভূমিকার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পিত হয়েছে। তাই আশা করা যায় সামগ্রিক ভাবে এই প্রকল্পের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পড়বে না। এই প্রকল্প উপকারী এবং দীর্ঘমেয়াদী হবে। তা সত্ত্বেও স্থানীয় ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। তাই প্রকল্প পরিকল্পনার সময়ই ভালো করে দেখে নেওয়া হয়েছে যাতে কোন কাজই যেন পরিবেশকে ক্ষতি না করে বা ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করা যায়। প্রতিটি উপ-বিভাগের কার্য্যকলাপও দীর্ঘ সময় ধরে যাতে উপকারে আসে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির যাতে বহুদিন পথ চলায় কার্য্যকরী হয় সে কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে। উপকূল এলাকার প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের যথার্থ পরিচালন ব্যবস্থা , প্রাকৃতিক সম্পদ , তার কার্য্যকারিতা এবং তাদের অবদানের উপর নির্ভর করছে প্রকল্পটির পরিবেশগত উপযোগিতা।

৬১) প্রাকৃতিক বাসস্থান , জাতীয় উদ্দান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য: প্রকল্পে কোনভাবেই উপকূল এলাকার প্রাকৃতিক বাসস্থানকে নষ্ট করে বা ক্ষতি করে কিছু করা হবেনা। প্রকল্পে এমন কিছুই নেই যাতে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় (১) জমি ও জলের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বাসস্থানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন , (২) জমিতে গাছপালা থাকলে নষ্ট করা হবেনা, (৩) প্রাকৃতিক বনসম্পদকে কোন ভাবেই ধ্বংস হবে না , (৪) কোন রকম প্রাকৃতিক বাসস্থানকে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে প্লাবিত করা হবে না, (৫) জলজমি সেচন, ভরাট করার কোন পরিকল্পনা এই প্রকল্পে নেই। এই প্রকল্প কোনভাবেই আকাশ পাতাল পরিবর্তনকে সমর্থণ করেনা। স্বাভাবিক সবুজ ধ্বংস থেকেও দূরে থাকা হবে। নির্ধারিত প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণকেও কোনভাবে প্রভাবিত না করার চেষ্টা করা হবে। দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষনের বিষয়টি বিবেচনা করেই প্রকল্পটি পরিচালিত হবে। প্রকল্প চলাকালীন লক্ষ্য রাখা হবে যেন তৃতীয় পক্ষের কোন প্রভাব উপকূল অঞ্চলের বাস্তুসংস্থান মূলক সম্পদকে কোন ভাবে প্রভাবিত না করে এবং কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উদাহরনস্বরূপ প্রয়োজনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব রোধ করতে বা কমাতে অন্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থও ব্যবহার করা হবে।

৬২) অরণ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী: এই প্রকল্পে (১) গাছ কাটার বা বন নষ্ট করার, (২) বনের স্বাস্থ্যহানীর, (৩) কোন জাতি গোষ্ঠীর বনের প্রতি অধিকার বৃদ্ধি বা হ্রাস করার এবং বনাঞ্চলের কোন পরিবর্তন পরিচালন পদ্ধতির ও ব্যবহারের পরিবর্তন করা হবেনা। সে সকল এলাকাতেই ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য বৃক্ষরোপন করা হবে যেখানে গাছ একেবারেই নেই। ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য কোন গাছের স্বাস্থ্যহানী করা অথবা প্রকল্প এলাকায় জনগনের অরণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত যুক্ত কোন কল্যাণকর কাজে প্রকল্প বাধার সৃষ্টি করবে না। বনের সীমানা কমিয়ে দেওয়ার কোন রকম সম্ভাবনা এই প্রকল্পের ফলে নেই। কোন ভাবেই অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খায় না এরকম কোন প্রজাতির প্রবেশ রোধ করা হবে। প্রকৃতির ক্ষতির সমস্ত সম্ভাবনা এড়ানো হয়েছে। বাদাবন ও আশ্রয়বেল্টের জন্য বৃক্ষরোপনে বিশ্বব্যাঙ্ক পরিচালিত অন্য

প্রকল্পগুলির মতো কমিউনিটি ম্যানেজমেন্টকে আশ্রয় করে পথ চলা হবে। বন দপ্তরের বা রাজস্ব দপ্তরের জমিতে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরোপন করা হবে। বনদপ্তরের কোন এলাকা যেখানে ইতিমধ্যে বনাঞ্চল রয়েছে সেখানে এই ধরনের বৃক্ষরোপন করা হবে না। ফলে ফরেস্ট অ্যাক্ট অনুসারে বাদাবন বা শেল্টার বেড বৃক্ষ রোপনের জন্য কোন আইনী ছাড়পত্র লাগবেনা। বৃক্ষরোপনে বা আগাছা নিধনে কোনধরনের সিন্থেটিক রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার হবে না।

৬৩) সাংস্কৃতিক সম্পদ : এই প্রকল্পে কোন পরিচিত ঐতিহ্যশীল স্থানের উপর কোন ধরেনের আঘাত করার পরিকল্পনা নেই। কোন ভাবেই এই প্রকল্পে কোন ধরনের খনন কার্য্য চালানো বা কোন স্থানকে দূষিত করার পরিকল্পনা নেই। বরং এই প্রকল্প সেই সব স্থানের সংরক্ষণের ও পুন:নির্মানের উপর জোর দেয়, সেই সঙ্গে সেই সব সাতটি ধ্বংসপ্রায় ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের (যদিও কোনটিই জাতীয় হেরিটেজ সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃত নয়) সংরক্ষণেরও সমর্থন করে। এই প্রকল্প দীঘার (পশ্চিমবঙ্গ) মেরীন অ্যাকুরিয়ামের সংরক্ষন ও পুন :নির্মানকেও সমর্থন করে, সেই সঙ্গে দ্বারকায় (গুজরাট) একটি সামুদ্রিক প্রদর্শনশালা ও গবেষনাকেন্দ্রের নির্মানকেও সমর্থন করে। সকল ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের সংরক্ষন ও পুন: নির্মানে দক্ষ কারিগর এবং সুপারভাইজার নিয়োগ করা হবে। নীতি নির্ধারিত হয়েছে এই ধরনের কাঠামোগুলির নির্মানে, রক্ষনাবেক্ষণে এবং পুন:নির্মানে সেরা পেশাদারি মান বজায় রাখার উপরও সতর্ক নজর রাখা হবে ও পর্যবেক্ষণ করা হবে। ইতিমধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও এই প্রকল্পে অতিরিক্ত হিসাবে এই সব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহন ও রূপায়ানের প্রচেষ্টা চালানো হবে। প্রকল্প তৈরি করার সময়েই এই বিষয়ে বিভিন্ন দিক ভাবা হয়েছে।

৬৪) দরিদ্র ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রকল্পের অগ্রাধিকার ভাগে অন্তর্ভূক্তি : প্রকল্পের পরিকল্পনার স্তর থেকেই উপকূলবাসীদের অংশগ্রহন ও সেখানকার মহিলাদের সমস্যাগুলির কথা মাথায় রেখেই প্রকল্পটি সাজানো হচ্ছিল। উপরিল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ্যস্তরের প্রতিটি কর্মকান্ডের কথা ভাবা হয়েছে। এই সমস্যাগুলির উপর নির্ভর করেই জাতীয়, রাজ্য ও গ্রামস্তরে স্বার্থজড়িত অংশীদারদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ কিছু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগের পরিকল্পনাও করা হয়েছে তাদের জীবন জীবিকার উন্নতির কথা মাথায় রেখে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির অংশগ্রহনের মাধ্যমে এই সমস্ত বিনিয়োগগুলির রূপায়নের কথা ভাবা হয়েছে। আই সি জেড এম প্রক্রিয়া কে দীর্ঘ সময় ধরে কার্য্যকরী করতে এই নীতি গ্রহন করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষদের জীবন জীবিকার সুরক্ষার কথা বিবেচনা করেই এই প্রকল্পটি সাজানো হয়েছে। জাতীয় রাজ্য ও গ্রাম স্তরে স্বার্থজড়িত অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই বিষয়গুলিকে নির্বাচন করা হয়েছে। উপকৃতদের বেছে নিতে কিছু প্রাক নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা হবে যেমন উপকূল অঞ্চলের দরিদ্র অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং স্বচ্ছতার জন্য আঞ্চলিক ভাষার কাগজে বিজ্ঞাপিতও করা হবে সেই সব নিয়ম কানুন। এই প্রকল্পে উপজাতি জনজাতির চাহিদা, জীবিকার প্রয়োজন যথাযথ ভাবে যাতে গ্রামীণ পরিকল্পনায় (বিশেষত স্থানীয় সংরক্ষন ও জীবন জীবিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত) থাকে তা সুনিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও মহিলাদের কথাও বিশেষ করে ভাবা হচ্ছে। ভারত সরকারের আশ্বাসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ডের কথা ভাবা হয়েছে যাতে মহিলাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় মহিলা মৎস্যজীবিদের পন্য বাজারজাত করার ব্যপারে সহায়তা করা (কাঁচা মাছ, তার সঙ্গে আরও লাভজনক সামগ্রি যেমন মাছের আচার, প্রথাগত হাতের কাজ ইত্যাদি) এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে , বিশেষতঃ যেখানে প্রয়োজনীয় বাজারের সংযোগ রয়েছে সেখানে।

৬৫) বিভিন্ন চিহ্নিত উপজাতি গোষ্ঠীর উপর একটি সামাজিক পর্যালোচনা (যা পরিবেশ ও সামাজিক পর্যালোচনার অন্তর্গত) করে দেখা নেওয়া হয়েছে কারা এতে উপকৃত হতে পারেন। প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ২৬৭ টি গ্রামে সমীক্ষা করে দেখা গেছে প্রকল্পের কোন আলাদা পরিকল্পনা এই উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক ভাবে উপকৃত করবে না।

সমীক্ষায় দেখা গেছে কোন গ্রামই একক ভাবে উপজাতিদের বলে চিহ্নিত করা যাচ্ছেনা। প্রকল্পের ২৬৭ টি গ্রামের মধ্যে একমাত্র গুজরাটের একটি গ্রামে প্রায় ৮৭% উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ থাকেন। গ্রামবাসীদের নিজেদের করা গ্রামীন পরিকল্পনাই সাংস্কৃতিক বিষয়ে যথাযথ। অন্য গ্রামগুলিতে ২০৫ টিতে ১ % বা তারও কম উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন, ৩৬ টি গ্রামে ১ থেকে ৫%, ৯ টি গ্রামে ৫ থেকে ১০%, ১২ টি গ্রামে ১০ থেকে ২৫% এবং ৪ টি গ্রামে ২৫ থেকে ৫০% উপজাতি মানুষের বসবাস। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সাংস্কৃতিক ভাবে আলাদা বলে কোন উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক পরিকল্পনা করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে না।তবে এটা লক্ষ্য রাখা হবে যে গ্রামীণ পরিকল্পনার সময় যেন সবার সঙ্গে সে সব গ্রামের উপজাতি মানুষেরও সমানভাবে অংশগ্রহন করেন।

৬৬) **অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন:** এই প্রকল্পে কোন মানুষকে জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করা জমি অধিগ্রহন করা বা পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেই। যতটা সম্ভব রাজস্ব দপ্তরের বা বন দপ্তরের জমিতে বনায়ন করা হবে। তবে উড়িষ্যার ক্ষেত্রে ১০৫ হেক্টর ব্যক্তি মালিকানর জমিতে আশ্রয়স্থল হিসাবে বৃক্ষরোপনে জমির মালিকদের সম্মতিতেই অধিগ্রহন না করে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৫,৫০০ হেক্টর সরকারি জমি জরীপ করা হয়েছে এবং কোন ধরনের জবরদখল পাওয়া যায়নি। কোন ধরনের স্বেচ্ছা জমি দানের ঘটনা লিপিবদ্ধ করে সর্বসাধারণের গোচরে আনা হবে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েতকেও অবহিত করা হবে। তবে অভিজ্ঞতায় বলে যে পুরো প্রকল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন ধরনের জবরদখলের ঘটনা ঘটবে না বলা ঠিক না। সম্ভাব্য সেই সব ক্ষেত্রে প্রকল্পে পুনর্বাসনের নীতি কাঠামো রয়েছে, যা ন্যাশানাল রিসেটলমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন পলিসি ২০০৭ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং ব্যাঙ্কের OP4.12. মেনে করা হবে। উল্লেখ্য এটি শুধু মাত্র যে সব সমস্যা শুরুতে পরীক্ষা করা হয়নি বা ধরা পড়েনি সেগুলির ক্ষেত্রেই পুনর্বাসনের কথা ভাবা হবে। এই পুনর্বাসন প্যাকেজে রয়েছে - (১) নির্দিষ্ট পন্থা যাতে সত্যিকারের সমস্যায় অবাঞ্ছিত জবরদখলকারীর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে, (২) ক্ষতির পরিমান যাচাই করে ক্ষতিপূরণ ঠিক করা, (৩) একটি ত্রিস্তরের অভিযোগ গ্রহনের পন্থা নির্ধারণ ও তার বহুল প্রচার। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোন সম্যক ধারনা নেই তবুও এতে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে।

৬৭) প্রকল্পের আই সি জেড এম পরিকল্পনার জন্য প্রকল্পে আর্থিক প্রস্তুতি রয়েছে। গুজরাটের কচ্ছের হ্রাণ, উড়িষ্যার পারাদীপ-ধামরা, গোপালপুর-চিল্কা এবং পশ্চিমবঙ্গের গোটা উপকূলের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। এই উপকূলের বাসিন্দাদের জান ও সম্পদের রক্ষা করতে আই সি জেড এম এ আঞ্চলিক স্তরে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যদিও এটি অবাঞ্ছিত যে কোন অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এতে করতে হবে। তবুও পরিকল্পনার স্তরে বিশ্বব্যাঙ্কের OP 4.12, এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীকে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি ও আইন প্রয়োগ করা হবে আই সি জেড এম পরিকল্পনাকে রূপায়ণের জন্য।

৬৮) এই প্রকল্পে একটি সামাজিক গ্রহনযোগ্যতার কথা ভাবা হয়েছে এর প্রতিটি ভাগে যা কার্য্যকর করা হবে। সামাজিক গ্রহনযোগ্যতার জন্য সোশ্যাল অডিট, সিটিজেন স্কোর কার্ড, এবং রিপোর্ট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে কাজের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করার ও তার ভিত্তিতে বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নিরবয়চন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর জন্য শক্তিশালী অভাব অবিযোগ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা হবে। এই অবিযোগ গ্রহনের শাখা জাতীয় ও রাজ্য স্তরের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে থাকবে। বিভিন্ন উপায়ে টোল ফ্রী ফোন, ওয়েব ঠিকানা ও কাগজে চিঠি লিখে এসব জায়গায় অভিযোগ জানানো যাবে এবং ঘড়ি ধরে সে সব অভিযোগের সমাধান করা হবে। তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর সব নির্দেশিকা এই প্রকল্প মেনে চলবে এবং সকল প্রকল্প অংশগ্রহনকারীর সঙ্গে তথ্য বিনিময় করবে। প্রকল্পের প্রচারে সব ধরনের গনমাধ্যম যথা মূদ্রণ মাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যম, বিল্ বোর্ড, পোষ্টার, দেওয়াল লিখন সহ আরও নানা স্থানীয় বহুল প্রচারিত মাধ্যমকে ব্যবহার করা হবে।

৬৯) পরিবেশের উপর নজরদারি ও রিপোর্ট পেশের পরিকল্পনা: এই প্রকল্পের জন্য একটি বিস্তারিত বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে পর্যবেক্ষনের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পর্যালোচনা করে দেখা হবে যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া ঠিক ভাবে চলছে কিনা। এতে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বা বিভাগ অনুসারে কাজের গতি, পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় বিষয় ও পর্যবেক্ষণ নিয়মিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

পরিবেশের উপর নজরদারি ও গবেষনার জন্য অর্থের আবন্টন

৭০) এই প্রকল্পেপর নানা দিক বিচার করে এবং পরিবেশের উপর নানা প্রভাব বিচার করা ও তার প্রতিকারে বিভিন্ন কর্মসম্পাদনা করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য খরচা নির্ধারিত হয়েছে ৩৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

কাজের প্রকার	জাতীয়	গুজরাট	উড়িষ্যা	পশ্চিমবঙ্গ	মোট
ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান নির্মানে	১২.৯০	৮.৮০	১০.৪২	০	৩২.১২
ICZM পরিকল্পনা পদ্ধতি	০	৩.৫২	৫.২১	১৯.৯৩	২৮.৬৬
ঋণ দান	০	৪৯.১৯	৭৩.৬২	১৮৯.৭৭	৩১২.৫৮
মোট	১২.৯০	৬১.৫১	৮৯.২৫	২০৯.৭০	৩৭৩.৩৬